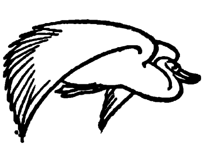


ধারা থেকে মাণ্ডু

দেবব্রত মুখোপাধ্যায়



প্রকাশক
প্রশান্ত ভট্টাচার্য
সারস্বত লাইব্রেরী
২০৬ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট্
কলিকাতা ৬

চিত্রকর্ম
দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

প্রথম প্রকাশ
পৌষ ১৩৬৩

দাম
আড়াই টাকা

মুদ্রাকর
বিভাস ভট্টাচার্য
সারস্বত প্রেস
২০৬ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট্
কলিকাতা ৬

চরন্ বৈ মধু বিন্দতি চরন্ স্বাদুমুদুম্বরম্ ।
সূর্যস্য পশ্য শ্রেমাণং যো ন তন্দ্রয়তে চরন্ ॥
চরৈবেতি, চরৈবেতি ।

চলাই অমৃতলাভ, চলাই সুস্বাদুফল, দেখ সূর্যের ঐ তেজপুঞ্জ, যে চলার শুরু থেকে এখনও অনিদ্র । এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো ।

গুরুদেব ভোলা চট্টোপাধ্যায় এবং অগ্রজ বিনয়কৃষ্ণ দত্তের আশীর্বাদ গ্রহণ ক'রে যাত্রা শুরু করেছিলাম এবার, তাই কিছু দেখতে পেরেছি, শিখতে পেরেছি এবং আঁকতে পেরেছি যা আমার পূর্ববর্তী বহু ভ্রমণেও সম্ভব হয়নি ।

এ রচনা অজ্ঞেয়কে জ্ঞানায়ত্ত করার চেষ্টা নয়, রম্যরচনা বা ইতিহাসও নয় ; শিল্পশিক্ষার্থীর অনুসন্ধিৎসা নিয়ে আমি চলেছি, ভ্রমণে দর্শন ঘটেছে, প্রত্যক্ষ করেছি ভারত-সংস্কৃতির ধারাবাহিকতা ; তার তথ্যগত প্রমাণ সম্বন্ধে মনে প্রশ্ন জেগেছে, যার যথার্থ মীমাংসা স্বল্পবিদ্বান আমার কাছে আজও জ্ঞান হয়ে ওঠেনি । ফলে এই যে প্রকাশ তা হয়তো অনেক ক্ষেত্রেই পরমজ্ঞানপুষ্ট নয় ; তবু চলমান পথিকের পথাতিক্রমকালীন এ সব প্রশ্নোত্তর মূল্যহীন হবে না বলেই আমার ধারণা । হিন্দুযুগের ধারানগরী কলা সম্পর্কে যে প্রশ্ন করেছিল, মধ্যযুগের মাণ্ডুতে যে সাংস্কৃতিক লেন-দেন ঘটেছিল তারই হদিশ খুঁজতে গিয়ে শিল্প-ঐতিহ্যের সম্মুখীন হতে হয়েছে বহুবার, যার ফলে ভ্রমণ কাহিনীর মাঝে মধ্যে শিল্প ও সংস্কৃতির ইতিহাসও প্রসঙ্গক্রমে আলোচিত হয়েছে । সনের তারিখগুলি সবই আনুমানিক ।

বন্ধু শ্রীগৌরকিশোর ঘোষের অনুরোধ এ লেখার প্রেরণা এবং বন্ধুবর শ্রীসাগরময় ঘোষ লেখাটির সংক্ষিপ্ত আকার দেশ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করেছিলেন। এঁদের আমি ধন্যবাদ জানাই।

এ লেখার সঙ্গে প্রকাশিত আমার আঁকা ছবির কয়েকটি ব্লক দিয়ে সাহায্য করেছেন স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ মহারাজ ও শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের কর্তৃপক্ষ, শ্রীসাগরময় ঘোষ ও দেশ পত্রিকার কর্তৃপক্ষ, শ্রীঅমূল্য চট্টোপাধ্যায় ও এন্টালী সাংস্কৃতিক সম্মেলনের কর্তৃপক্ষ এবং শ্রীহরপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও বিংশ শতাব্দী পত্রিকার কর্তৃপক্ষ। বাজবাহাদুর-রূপমতি এবং অভিসার নামের মধ্যযুগীয় চিত্র দুটির আলোকচিত্র দিয়ে সাহায্য করেছেন শ্রী এম, এস, রনধওয়া মাণ্ডু সম্বন্ধে নানা উপদেশ দিয়ে সহায়তা করেছেন পণ্ডিত বিশ্বনাথ শর্মা। এ সাহায্যের জন্য তাঁদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি। যার সহযোগিতায় আমার এ যাত্রা সম্ভব হয়েছিল সে শ্রীমান লালমোহন দত্ত এবং আর যাদের বিশেষ সহযোগিতায় এ লেখা সম্ভব হয়েছে তারা আমার অনুজপ্রতীম শ্রীমান অশোক ভট্টাচার্য, অবনী ঘোষ, চারু খাঁ ও দেবকুমার বসু। এদের জন্য আমার আশীর্বাদ রইলো।



প্রমাণ-পঞ্জী

॥ ইয়াজদানী ॥
মাণ্ডু দি সিটি অব জয়

॥ কর্ণেল সি, ই, লার্ড ॥
ধারা এ্যাণ্ড মাণ্ডু

॥ স্যার জেম্‌স ক্যাম্বেল ॥
বোম্বে গেজেটিয়ার
গুজরাট খণ্ডে প্রকাশিত প্রবন্ধ

॥ এল, এম, ক্রাম্প ॥
দি লেডি অব দি লোটাস

॥ ডঃ মতিচাঁদ ॥
অগ্রদশতক প্রবন্ধ :
বুলেটিন অব দি
প্রিন্স অব ওয়েলস মিউজিয়ম
অব ওয়েস্টার্ন ইণ্ডিয়া
১৯৫১-৫২ ; ২নং সংখ্যা

॥ অধ্যাপক তুচি ॥
টিবেটিয়ান পেইনটেড স্ক্রল

॥ কুমারস্বামী ॥
দি ডান্‌স অব শিব

॥ স্যার যদুনাথ সরকার ॥
গ্লিম্‌সেস অব মোঘল
আর্কিটেক্‌চার পুস্তকে
প্রকাশিত প্রবন্ধ

॥ ই, বি হ্যাভেল ॥
আগ্রা তাজ
ইণ্ডিয়ান স্কালপ্‌চার এ্যাণ্ড পেইনটিং

॥ সি, ভি, বৈদ্য ॥
মেডিভাল হিন্দু ইণ্ডিয়া

॥ ডি, আর, পাতিল ॥
গাইড টু মাণ্ডু

॥ কর্নেল টড ॥
এ্যানালস অব রাজস্থান

॥ ভি, স্মিথ ॥
অক্সফোর্ড হিস্ট্রি অব ইণ্ডিয়া

॥ ডব্লিউ, ডব্লিউ, হান্টার ॥
এ ব্রিফ হিস্ট্রি অব
ইণ্ডিয়ান পিপ্‌ল

॥ বেঞ্জামিন রোল্যাণ্ড ॥
দি আর্ট এ্যাণ্ড
আর্কিটেক্‌চার অব ইণ্ডিয়া

প্রমাণ-পঞ্জী

॥ স্টুক ও খাণ্ডেলবালা ॥
দি লাউড রাগমালা মিনিয়েচারস

॥ স্যার এইচ, এম, এলিয়ট ॥
মেমোয়ারস অব
জাহাঙ্গীর

॥ পার্শি ব্রাউন ॥
ইণ্ডিয়ান পেইনটিং

॥ এইচ, এ, আর, গিব ও
জে, এইচ, ক্রামার্স ॥
সর্টার এনসাইক্লোপিডিয়া
অব ইসলাম

॥ বি, এল, ধমা ও এস, সি, চন্দ্র ॥
আর্কিওলজি ডিঃ প্রকাশিত খাজুরাহ

॥ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ॥
নেমাবর প্রবন্ধ ঃ বসুমতী ১৩৩১

॥ নন্দলাল বসু ॥
শিল্পচর্চা

॥ বিমলকুমার দত্ত ॥
ভারত-শিল্প

॥ দেবব্রত মুখোপাধ্যায় ॥
বাঘ ও অজন্তা

॥ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ ॥
সঙ্গীত ও সংস্কৃতি ঃ পূর্বভাগ ও উত্তরভাগ

॥ ডি, টি, দেবেন্দ্র ॥
গাইড টু সিগিরিয়া

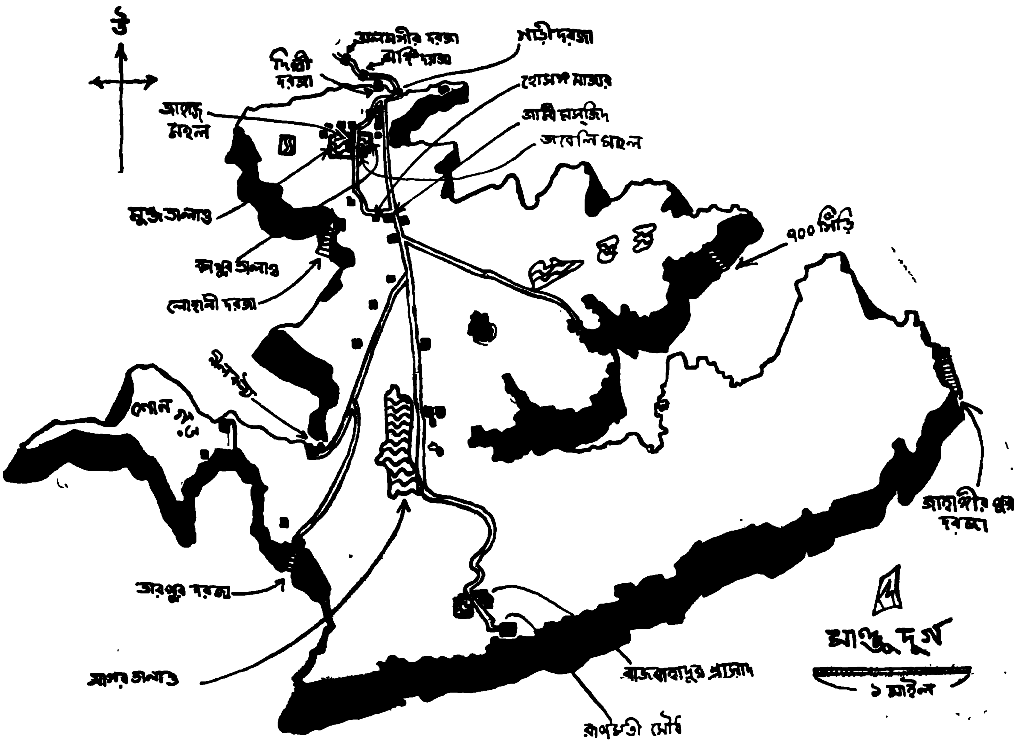
॥ এইচ, ই, উরা সূর্য ॥
হিস্টোরিক্যাল গাইড
টু অনুরাধাপুর রুইন্স

॥ সি, শিবরাম মূর্তি ॥
এ্যান্টিকুইটি এ্যাণ্ড এভলিউসন
অব আর্ট ইন ইণ্ডিয়া প্রবন্ধ ঃ
দি জার্নাল অব
ওরিয়েন্টাল রিসার্চ
মাদ্রাজ ১৯৩৪; ৮ম খণ্ড

॥ গভর্নমেন্ট অব ইণ্ডিয়া ॥
পাবলিকেসন ডিভিসন ঃ
চেন্না কেশব টেম্পল এ্যাট বেলুড়
দিলওয়ারা টেম্পল্‌স
মিনিস্ট্রি অব ট্রানস্‌পোর্ট ঃ
মাইসোর এণ্ড কুর্গ



পথ থেকে মাণ্ডু



মাণ্ডু দুর্গের মানচিত্র

শীতের মধ্যাহ্নশেষে ধার বা ধারা নগরী থেকে গিরিদুর্গ মাণ্ডু অভিমুখে আমার যাত্রা শুরু হ'ল। পথ-মধ্যস্থ গ্রাম নালচা পর্যন্ত মধ্যভারতের স্বাভাবিক রুক্ষ পারিপার্শ্বিকতা অতিক্রম ক'রে আমাদের যাত্রী ও ডাকবাহী বাস নালচায় খানিক বিশ্রাম নিল, তারপর আরও কিছু ডাক ও যাত্রী সংগ্রহ করে মন্থর থেকে মধ্যমগতিতে চলা আরম্ভ করল মাণ্ডুর পথে। ক্রমে আকাশ-ছোঁয়া মাঠের সীমান্তে নীলিমাময় হয়ে উঠল বিন্ধ্যাচল। আমার ও বিন্ধ্যের মাঝে সীমাহীন পথ বোধ হয় খুঁজে পেল দিগন্তের ঠিকানা, তাই সে গিরিরাজের উত্থান-পতনে ক্ষণে ক্ষণে ছন্দপতিত হয়ে দু'একবার উঁকি-ঝুঁকি মেরে হারিয়ে গেল কোথায়।

অতীতের হারিয়ে যাওয়া ইতিহাস আজ রূপ নিয়েছে রূপকথার। সেকালে কোন এক দিনমজুর কাঠুরে একদিন উদয়াস্ত হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম আর পাহাড়ী পথে দমভাঙ্গা ওঠানামা করে যখন পেটভরা খিদের আধ-পেটা রোজগার নিয়ে পরিবারের কথা ভাবতে ভাবতে ঘরমুখো চলছিল হয়ত তখন কোন ভাগ্যদেবতার দাক্ষিণ্যে পথে পড়া পরশ-পাথরের ছোঁয়াচ লেগেছিল তার কুঠারে। তারপর কুটিরে ফিরে ক্ষীণ দীপশিখার আলোয় দেখে তার চিরসাথী কঠিন কুঠারের রূপালী রঙ কখন যেন নরম সোনালীতে পরিণত হয়েছে। কুঠারের এ ধর্ম-পরিবর্তন তার কাছে

হয়ে দাঁড়াল চরম বিপর্যয়। বিভ্রান্ত কাঠুরে প্রতিবেশীর স্মরণ নিল, তাদেরই মাধ্যমে প্রচারিত হ'ল লোহার কুড়ুল সোনা হওয়ার গল্প। রাজার হুকুমে খোঁজ খোঁজ রব উঠল। আঁদাড়-পাঁদাড়, বন-বাদাড় খুঁজতে খুঁজতে শেষে এক জায়গায় সন্ধান মিলল পরশ পাথরের। সেইখানে গড়ে উঠল এমন এক নগর, যার সমকক্ষ নাকি সেদিন আর কোথাও ছিল না। সেই নগরেরই আজকের নাম মাণ্ডু।

সপ্তম শতকে ভারত ভ্রমণকারী চীনা পরিব্রাজক হিউএন্‌চাঙ্‌ যখন মালবে এসেছিলেন, তখন শুনেছিলেন প্রায় ষাট বছর আগে মহারাজা শিলাদিত্যের রাজত্বকালেই মালবে বৌদ্ধ-সংস্কৃতি চরম সার্থকতা লাভ করে। তিনি শিলাদিত্যের রাজধানী নির্দেশ করেছেন মহী নদীর দক্ষিণ পূর্বদিকে। ঐতিহাসিক কাওয়েল অনুমান করেছেন সে রাজধানী ধারানগরী। হয়তো এই ধারানগরীই মাণ্ডুদুর্গের প্রথম প্রেরণা।

তারপর মাণ্ডুর এ পথের হদিশ জুগিয়েছে সম্ভবত খৃষ্টীয় নবম শতক। কান্যকুব্জের গুর্জর-প্রতিহার রাজন্যদের সীমান্ত রক্ষার প্রয়োজনে হয়ত নির্মিত হয়েছিল গিরিদুর্গ মাণ্ডু। রথচক্রজর্জরিত সেদিনের এ পথ মুখরিত থাকত নরপতি, সেনাপতি অথবা গজঅশ্বসেনাবাহিনী এবং তাদের কলরব-বৃংহতি ও হ্রেষারবে।

পরে মালবে প্রবল হয়ে উঠেছিল পরমার সম্প্রদায়। উজ্জয়িনী ছিল স্বাধীন পরমার রাজাদের প্রাথমিক রাজধানী। ধীরে ধীরে রূপায়িত হ'ল ধারা নগরী, পরমার রাজারা ধারাকেই নির্বাচিত করলেন তাঁদের রাজপুরী।

হিউএন্‌চাঙের সমকালেই মালব সংস্কৃতির দেশজোড়া খ্যাতি ছিল। তিনি লিখেছেন, 'পঞ্চখণ্ড ভারতে জ্ঞানগরবিনী ছিল দুটি রাজ্য— দক্ষিণ-পশ্চিমে মালব এবং উত্তর-পূর্বে মগধ'।

রাজার পর রাজা এল গেল, ধাপের পর ধাপ গৌরবের সোপান

অতিক্রম করে চলল ধারা। পরমার এবং ধারা অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়ে, একে অন্যের পরিচয়ে পরিচিত হল। প্রচলিত প্রবচন হয়ে উঠল :

যাহাঁ পুআর তাঁহা ধার।
অউর ধার তাঁহা পুআর॥
ধার বিনা পুআর নেহী।
অউর নেহী পুআর বিনা ধার॥

এ খ্যাতি চরমে পেঁীছল মহারাজাধিরাজ মুঞ্জ এবং সম্ভবত তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র মহারাজাধিরাজ ভোজের সময় (অনুমান ১০১৮—৬০ খৃঃ অঃ)। সমসাময়িককালে ভারতীর বরপুত্র ভোজরাজের সমকক্ষ সর্বগুণবিভূষিত রাজা উত্তর বা দক্ষিণ ভারতে বিরল। ভোজ-বিদ্যা শুধুমাত্র ভোজবাজীতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। জ্ঞানী-সান্নিধ্যে তিনি অমর—'সরস্বতী কণ্ঠাভরণ,' 'রাজমার্তণ্ড' এবং 'রাজমৃগাঙ্ক' ইত্যাদি নন্দনতত্ব, যোগশাস্ত্র, জ্যোতিষশাস্ত্র প্রণেতারূপে ; শিল্পীর কাছে তিনি অমর 'সমরাঙ্গন-সূত্রধার' নামক শিল্পশাস্ত্রের রচয়িতারূপে ; জনমনে তিনি অমর বীর্যবান নরপতি রূপে। মধ্যভারতে প্রচলিত প্রবচন :

কাঁহা রাজা ভোজ।
অউর কাঁহা গাঙ্গু তেলী॥

বোধ হয় এটি দিগ্‌বিজয়ী তেলেঙ্গানা অধিপতি চোলরাজ গঙ্গাইকোণ্ডা চোল অর্থাৎ রাজেন্দ্র চোলের (সম্ভবত ১০১২—৪৪ খৃঃ অঃ) সঙ্গে ভোজরাজের জ্ঞান, বিদ্যা, শৌর্য-বীর্যের তুলনামূলক অভিব্যক্তি। স্থানীয় এক প্রাচীন কাহিনী সমসাময়িককালে ভোজরাজের জনপ্রিয়তার প্রমাণ বহন করছে। মহারাজা ভোজ একবার বানপ্রস্থ অবলম্বন করে কিছুদিন অজ্ঞাতবাস করছিলেন। সেই সময় জনসাধারণ তাদের পুণ্যবান রাজা স্বর্গত বলে ধারণা করে নিয়েছিল। একদিন তিনি তাঁর সভাকবি কালিদাসকে (বিক্রমাদিত্য-পারিষদ মহাকবি কালিদাস নন) দেখতে পেয়ে

তাঁকে তাঁর প্রিয় রাজধানী ধারার কুশল জিজ্ঞাসা করলেন। কালিদাস কবিতাছন্দে উত্তর দিলেন ঃ

অদ্যধারা নিরাধারা নিরালম্বা সরস্বতী।
পণ্ডিতাঃ খণ্ডিতা সর্বে ভোজরাজে দিবং গতে ॥

অর্থাৎ ভোজরাজ দিব্যলোক প্রাপ্ত হওয়ায় আজ ধারা নগরী আধারহীনা, দেবী সরস্বতী আশ্রয়হীনা এবং পণ্ডিতসমাজ খণ্ডিত। এ সংবাদ শ্রবণে দেশপ্রাণ ভোজরাজ শোকাহত হয়ে ভূতলশায়ী হলেন। তখন কবি কালিদাস আর এক শ্লোক বলে তাঁকে সান্ত্বনা দিলেন ঃ

অদ্য ধারা সদাধারা সদালম্বা সরস্বতী।
পণ্ডিতাঃ মণ্ডিতা সর্বে ভোজরাজে ভুবং গতে ॥

অর্থাৎ ভোজরাজ ভূতলে অবতীর্ণ হওয়ায় আজ ধারা নগরী সর্বদা আধারযুক্তা, দেবী সরস্বতী সর্বদা ভোজাশ্রিতা এবং পণ্ডিতকুল জয়মণ্ডিত। আজ আর এই সর্বশাস্ত্রবিদ্ মহৎকর্মী রাজা ভোজের শিল্প-নিদর্শন কালজয়ী হয়ে বিশেষ কিছু অবশিষ্ট নেই। সরস্বতীর লীলাক্ষেত্র, মধ্যযুগীয় ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ-বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্বখ্যাতা নগরী ধারা এ বিষয়ে সম্পূর্ণ রিক্তা। তবু নর্মদার দক্ষিণে ঊনবিংশতি কোটি বা ঊনগ্রামে এবং ইন্দোর থেকে শ'খানেক মাইল দূরে মালবের দক্ষিণ-পূর্বে নর্মদা তীরে নেমাবরে আর কৃষ্ণসিন্ধু তীরে বিহার নগরে তার অল্প কিছু ছিটেফোঁটা চিহ্ন এদিক-ওদিক ছড়িয়ে আছে। সমগ্র মালবের এই সৌভাগ্যসময়ে মালব-রাজধানী ধারার মাত্র ২২ মাইল দূরে বিরাজমান বিন্ধ্যাচলের এ পরমাসুন্দরী শ্যামল-স্নিগ্ধ গিরিদুর্গ মাণ্ডু নিশ্চয়ই ঐসব সর্বগুণগ্রাহী পরমার রাজাদের সৃজনশীল আশীর্বাদে বঞ্চিত ছিল না।

সম্বিৎ ফিরে পেলাম বাসের ঝাঁকানিতে, বৃহৎ থেকে বৃহত্তর হয়ে দ্রুত এগিয়ে আসছে গিরিরাজ বিন্ধ্য। পথের পাশে কালকবলিত জীর্ণ

মুশাফিরখানা ও মসজিদ হিন্দুযুগ থেকে আমার চিন্তা মুসলমান আমলে ফিরিয়ে দিল। পথ হঠাৎ ঘুরে গেল বিন্ধ্যের অন্তর্দেশে। কাকড়া-খো এর গভীর খাদের পাশ দিয়ে চলতে চলতে হিমালয়কে মনে পড়ছিল। তেমনি অতলস্পর্শী খাদ, শীতের অপরাহ্নে আবছা কুয়াশা গড়িয়ে গড়িয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে তেমনি উপরে উঠছে। অভাব শুধু ঝাউ দেওদার-শাল-সেগুনের সে গগনচুম্বী উচ্চতার এবং সেই সঙ্গে সে শ্যামলিমার। রুক্ষ আবহাওয়ার মধ্যে দু'চারটে নানাজাতীয় গাছ এদিক ওদিক থাকলেও তাদের উচ্চতা বিন্ধ্যের মতই সীমাবদ্ধ।

ভারতে মুসলমান আগমনের প্রাথমিক রূপ ছিল, খাইবার গিরিবর্ত্ম-পথে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দেশের বিভিন্ন অঞ্চল বছর বছর লুঠতরাজ ও কর আদায়ের প্রয়োজনে আক্রমণ এবং পরে নিজ দেশে দ্রুত পশ্চাদপসরণ করা। ক্রমে তাঁরা বিজিত স্থানে বসবাস আরম্ভ করলেন, প্রায় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষে উত্তর ভারত মুসলমানের কবলিত হ'ল। তারপর ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সামস-উদ-দিন ইলতুতমিস মালব আক্রমণ করেন এবং উদ্যান নগরী উজ্জয়িনী, বিদিশা ইত্যাদি জয়োল্লাসে ধ্বংস করে দিল্লী ফিরে যান। কিছুদিন পরে দিল্লীর সুলতান আলা-উদ-দিন খিলজীর হুকুমে তাঁর সেনাপতি আইন-উল-মুলুক, সম্ভবত নপুংসক, মালিক কাফুর ১৩০৫ খৃষ্টাব্দে মাণ্ডু দুর্গ আক্রমণ করে পরমার রাজ্যের শেষ চিহ্নটুকুও নিঃশেষ করেন। সেই সময় চতুর্দশ শতাব্দীর গোড়ায় দক্ষিণ ভারতও ইসলামের বশ্যতা স্বীকার করে। এই সব লুণ্ঠনধর্মী, ধ্বংসকামী সেনাদলে সৃজনশীল শিল্পী বা যোগ্য স্থপতির সঙ্গ সম্ভব ছিল না, যুদ্ধের প্রয়োজনে কারিগর বা কর্মকার শ্রেণীর সাহায্যই তাঁদের কাম্য ছিল। তাই সঙ্গে নিতেন মিস্ত্রী, কামার, ছুতোর ইত্যাদি কারুশিল্পীদের। যখন কোন হিন্দু বা বৌদ্ধ রাজ্য ধ্বংস করে হঠাৎ তাঁদের ঈশ্বর উপাসনার ভক্তি জাগতো, তখন বিজিতের ভগ্ন ধর্মমন্দির থেকে মালমশলা আর

স্থানীয় শিল্পীস্থপতিকে ব্যবহার না করে, দ্রুত মসজিদ নির্মাণের আর কোন উপায় খুঁজে পেতেন না। তাছাড়া ধর্মানুষ্ঠানের পুঁথিগত নিয়মকানুন ছাড়া শিল্পগত বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে উপদেশ দেবার মত জ্ঞানও তাঁদের ছিল না। ফলে প্রাথমিক মসজিদ, মহল ইত্যাদিতে তুর্কী, আফগান বা পাঠানী স্থাপত্যরীতির সঙ্গে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন স্থাপত্য প্রায়ই মিলে-মিশে গেছে। তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় দিল্লীর প্রাচীন কুতুব এলাকার কোয়াত-উল-ইসলাম মসজিদে। এখনও সেখানে প্রস্তরস্তম্ভে কিছু কিছু হিন্দু মূর্তি অবিকৃত অবস্থায় দেখা যায়। আর মাণ্ডুর এই প্রাথমিক ইসলাম স্থাপত্যেও যথেষ্ট হিন্দু ও জৈন প্রভাব দেখতে পেয়েছি।

এধার-ওধার আরও কয়েকটি জীর্ণ সরাইখানা ও কোতোয়ালীর ভগ্নাবশেষ পেরিয়ে পথ হঠাৎ নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ল একপাশে অতলস্পর্শী খাদ আর অন্য পাশে গগনস্পর্শী পর্বতের মধ্যে। মাঝে মাঝে যোজকধর্মী পথ দু'পাশেই গভীর খাদ রেখে এ-পাহাড় থেকে ও-পাহাড় পাড়ি দিয়েছে। এমনি এক পথযোজক পেরিয়ে কালপুরুষের খবরদারী উপেক্ষা করে দুঃসাহসী সুলতানী সড়ক আমাদের হাজির করল উত্তরের প্রথম দুর্গতোরণ আলমগীর-দরওয়াজার মধ্যে। ইতিহাসের পাতায় প্রথম পরিচিত হই শাহেনশা' আলমগীরের সঙ্গে। চমকিত হয়েছিলাম সে চরিত্রের বিভিন্নতা দেখে। আজ সন্ত্রস্ত হলাম বাদশাহ আলমগীরের সাক্ষাৎ সম্বন্ধবর্জিত মাণ্ডু দুর্গের দম্ভোদ্ধত গম্ভীর আলমগীর দরওয়াজায় প্রবেশ মুহূর্তে। তারপর আর এক মোড়ে ভাঙ্গী দরওয়াজা পেরিয়ে দিল্লীমুখী দিল্লী দরওয়াজাকে সম্ভ্রমে পাশ কাটিয়ে খিড়কীদুয়ার গাড়ি-দরওয়াজার পথে দুর্গ রে প্রবেশের অধিকার পেলাম আমরা জনসাধারণ

সন্ধ্যা আগত, শ্মশান স্তব্ধ ; জীর্ণ দম্ভাহত, প্রাসাদস্তূপ পিছনে

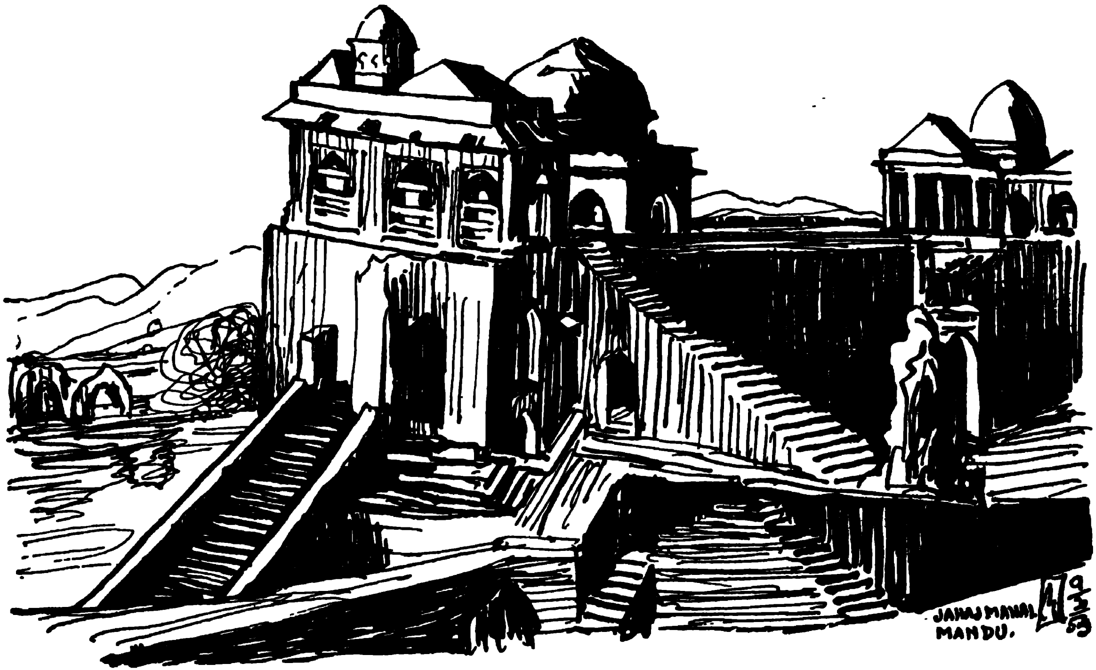
ফেলে বিস্ময়-বিমূঢ় আমাকে নিয়ে বাস এসে থামলো দুর্গমধ্যস্থ গ্রামে। বাস থেকে নেমে একজন লোকের সন্ধানে ঘুরতে লাগলাম। আমার এ স্বল্পভার 'হ্যাভারস্যাক' আমি নিজেই বহনে সক্ষম হলেও ঐ বোঝা বহনের ছুতো করে অন্তত একজন প্রাণী বা পথপ্রদর্শকের সঙ্গ পাব এই আশায়। এ মৃতের রাজ্যে সবই প্রাণহীন লাগে, কেমন যেন গা ছমছম করে। বহুকষ্টে লোক যোগাড় হলো, তাকে সঙ্গী করে রেস্ট হাউস অভিমুখে রওনা হলাম। এখানে কোন যানবাহনের ব্যবস্থা নেই, বাস থেকে নেমেই স্বাবলম্বী হতে হয়। অবশ্য ভাগ্যবান হলে দু-একজন ভারবাহীর হদিস মিলে যেতেও পারে। এদিক-ওদিক প্রত্নতত্ত্ববিভাগের তকমা আঁটা মসজিদ, মাজার, মাদ্রাসা, মঞ্জিল, মহল—তার মধ্য দিয়ে পথ।

রূপোর কাঠি ছোঁয়ানো মৃত এ রাজপুরীর প্রাণ-ভোমরার খোঁজে কোন সে রাজপুত্র কোথায় অপেক্ষায় রয়েছে, কোথায় বা সেই অনন্ত সুপ্তিমগ্না রাজকন্যা, কোন্ পুরিতে পাব সেই প্রসাদী বিল্বপত্রের স্তূপ, যার নীচে আশ্রয় নিলে আগামী রাত্রের বিভীষিকা থেকে নিরাপদ হ'ব! পথ ক্রমে অন্ধকার এক তোরণের মধ্যে নিয়ে হাজির করল। সন্তর্পণে অন্ধকার পেরিয়ে আসতে গোধূলির ম্লান আলোতে দেখি সত্যই প্রবেশ করেছি এক রাজপুরীতে। কল্পলোকের সৌন্দর্য ছোঁয়া এ প্রাসাদপুরী যেন 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা মধ্যিখানে চর'। ওপারে মুঞ্জতালাও, এপারে কাপুরতলাও, মধ্যিখানে যোজকের মত জাহাজ-মহল। হয়ত ওখানে পাব রূপকথার সাগর-ছেঁচা সৌন্দর্যময়ী সেই মেয়ে, জীবন্মৃতা সেই রাজকন্যাকে।

সঙ্গীর কন্ঠস্বরে চমক ভাঙল। প্রত্নতত্ত্ববিভাগের নির্দেশনামা পড়ে বুঝলাম তাবেলীমহল অর্থাৎ হাতীশালা-ঘোড়াশালার পাশে এসে দাঁড়িয়েছি। দোতলামহল, বোধ হয়, এর নীচে ছিল আস্তাবল আর উপরে ছিল পাশের

তোরণ-রক্ষিনী বাহিনীর আবাস। বাদ্‌শাজাদীর অন্দরমহলে, ক্রীড়া সরোবরের সামনে পুরুষ বা খোজাবাহিনীর উপস্থিতি নিশ্চয়ই অবাঞ্ছিত ছিল, তাছাড়া ইতিহাসের নজিরও পেলাম—জাহাজমহলের স্রষ্টা গিয়াস-উদ-দিন খিলজীর (১৪৬৯ খৃঃ অঃ) নিঝ‍ঞ্ঝাট রাজত্বে হুরির সাম্রাজ্য ছিল এখানে। পাঁচ হাজার তুর্কী, পাঁচ হাজার আবিসিনিয় এবং পাঁচ হাজার বিভিন্ন দেশীয় ললনা—একুনে পনের হাজার নির্বাচিত শ্রেষ্ঠা সুন্দরী খিলজী সাহেবের দেহচর্যা থেকে দেহরক্ষা পর্যন্ত সব জানানা-মর্দানার কাজেই নিযুক্ত ছিল এখানে। এ প্রমীলার রাজ্যে এঁরাই ছিলেন সব চারু ও কারু শিল্প এবং জ্ঞান ও বিজ্ঞানের জিম্মাদার। কাজীগিরি-হাকিমী থেকে উজিরী-কোতোয়ালী ইত্যাদি সবই অলঙ্কৃত ক'রেছিলেন এই শ্রীমতীরা। শাহী-খানদানের খান-খানা বা তাঁর বিশেষ অনুগ্রহের পাত্র ছাড়া পুরুষের এখানে প্রবেশ নিষেধ। শঙ্কাকুল মনে নিজেকে প্রশ্ন করলাম—হে অনধিকার প্রবেশকারী বঙ্গবীর-পটুয়াপুঙ্গব, বলি, গর্দান স্বস্থানে থাক্‌বে তো!

মধ্যভারতের প্রত্নতত্ত্ববিভাগ তাবেলীমহলকে রেস্ট হাউস নির্বাচন করে রসিক মনের পরিচয় দিয়েছেন। একতলায় একটি আধুনিক রেস্তঁরা, দোতলার বিশাল কক্ষকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে বাসগৃহ ও ভোজনকক্ষ বানানো হয়েছে। সামনে বৃহৎ বারান্দা কাপুরতলাওএর উপর পর্যন্ত প্রসারিত। তিনতলার ছাদে দু'টি মধ্যম আকারের গম্বুজ পাহারা দিচ্ছে চতুর্দিকের সীমানাকে। কুর্নিশ করে এসে দাঁড়াল রেস্ট-হাউসের রক্ষক বা ভৃত্য, পথ দেখিয়ে দোতলায় এনে, আকাশ-ছোঁয়া কপাটে কালের কুলুপে কল্পনার চাবি লাগিয়ে এক হেঁচকায় খুলে ফেলল সে। নীরব নিস্তব্ধ এ পুরীর উপস্থিত আমিই একমাত্র জীবন্ত বাসিন্দা, অতএব প্রথম কক্ষই আমার জন্য নির্বাচিত হল—একেবারে গম্বুজের নীচের ঘরে। এত সুবন্দোবস্তযুক্ত রেস্ট-হাউস এদিকে আর কোথাও



জাহাজমহল



মাণ্ডু দুর্গ প্রাকার

দেখিনি। প্রতি ঘরের সঙ্গে শৌচঘর। প্রতি ঘরের মেঝে কার্পেটে মোড়া, তার উপর টেবিল, ড্রেসিং-টেবিল, আলনা, আরাম-কেদারা, খাট, বিছানা ইত্যাদি—একেবারে এলাহি কারবার। যোগ্য স্থানের যোগ্য ব্যবস্থা। এমন কি রেস্ট-হাউসটিতে বিজলীবাতির বন্দোবস্তও আছে, অবশ্য সেটা চালু করা হয় কোন রাজনীতিক বা শিল্পপতি, নিদেনপক্ষে সরকারী আমলাদের প্রয়োজনে, আমার মত কলাবিদ্ অধমদের জন্য কেরোসিন বাতির ব্যবস্থা।

চায়ের হুকুম দিয়ে জিনিষপত্র গুছিয়ে ফেললাম। আণ্ডিল-বাণ্ডিল খুলে আমার ভ্রমণপথের বিশেষ বিশেষ যাযগা—সাঁচী, খাজুরাহো, উজ্জয়িনী, গোয়ালিয়র, বাঘ ইত্যাদির ছবি এদিক ওদিক টাঙিয়ে বেশ একটি শিল্পপরিবেশ তৈরি করা গেল। তারপর কাপুরতালাও-এর জলছোঁয়া বারান্দার আরাম-কেদারায় আরামে শুয়ে জাহাজমহল দেখতে লাগলাম। বল্গাহীন কল্পনার জাল বুনতে বুনতে কখন যে জাহাজ-মহল আঁকা শুরু করে দিয়েছি বুঝতেই পারিনি। শেষ করে দেখি, এক বৃদ্ধ বাবুর্চি পেছন থেকে সামনে এসে সেলাম করে চা এগিয়ে দিল। চোস্ত উর্দুতে সে আমায় প্রশ্ন করল, "ক্ষমা করবেন, আপনি কি বাঙলাদেশ থেকে আগত ?" বিস্মিত হয়ে বললাম, "বুঝলে কি করে ?" একগাল হেসে বড়া মিয়া উত্তর দিল,—"আমার পূর্বপুরুষ এই শাহীখানদানের খাস বাবুর্চি। দেশ-বিদেশের বহু সাহেব-সুবো দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে, সেই সঙ্গে হাত পাকিয়েছি বহু রুচির খানায়।" খুশী হয়ে প্রশ্ন করলাম, "বলত এখন, এ অধমের জন্য কি ফলার জুটবে ?" বলল,—দুরকম ব্যবস্থাই আছে এখানে, গোঁড়াদের জন্য হয় নীচের রেস্তরাঁর হিন্দু-খানা বা উপরের বাবুর্চিখানা এবং উদারপন্থীদের জন্য 'যেইসা মর্জি'। খানদানে এসে খানদানী-খানা ছেড়ে দেব এরকম বেতমীজ্ আমি নই, তাই বৃদ্ধেরই



রাজা রামমোহন



পরমহংস দেব



ডেভিড হেয়ার



উইলিয়াম কেরী

এবং দেহীকে পর্যন্ত কম্পিত করে তুলেছে। আবার দমকা হাওয়া গর্জে উঠল, আবার আর্তনাদ, আবার সেই দীর্ঘশ্বাস। ক্ষুধিত-পাষাণ বুঝি জাগল। তবে কই সে পাগলা মেহের আলীর বরাভয়, 'সব ঝুটা হ্যয়'।

লাফিয়ে বিছানা থেকে নেমে দৌড়ে গেলাম জানালা বন্ধ করতে। বিন্ধ্যের বারশ' ফুট উপরে এ মধ্যযুগীয় প্রাসাদ। তার ন-দশ ফুট চওড়া দেওয়ালে আধুনিক সূক্ষ্ম জানালা দরজার সাধ্য কি ঝঞ্ঝা-ধর্মী বাতাসের দুর্বার গতি রোধ করা। হুড়কো, ছিটকিনি কবে ভেঙে উড়ে গেছে। মেঝের থেকে যথেষ্ট উঁচুতে, প্রশস্ত দেওয়ালের শেষ প্রান্তবর্তী জানালার নাগাল পাওয়া দুষ্কর, শুয়ে পড়ে কোনরকমে জানালা পর্যন্ত পেঁছে, ভারী একটা চেয়ারের ঠেকা দিয়ে এসে আবার বিছানার আশ্রয় নিলাম। পরিশ্রান্ত মন ও দেহ কখন যেন আবার নিদ্রামগ্ন হয়ে পড়ল।

বাবুর্চি-সাহেবের ডাকে ঘুম ভাঙল। দরজা খুলে দেখি, ট্রে-তে চা ও প্রাতরাশ নিয়ে হাজির হয়েছেন। সুপ্রভাত জানিয়ে তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হয়ে এসে, পরটা ও ডিম সহযোগে চা-পান চুকিয়ে ফেললাম। চিরসঙ্গী ছোট্ট হ্যাভারস্যাকটিতে রঙ-তুলি ও কাগজপত্র ভর্তি করে আর জলভর্তি ফ্লাস্ক কাঁধে ঝুলিয়ে নিচে নেমে কাপুরতালাও-এর সামনে এসে দাঁড়ালাম তাকে ভাল করে দেখবার জন্যে। চতুর্দিক পাথরে বাঁধান। এক সময় মাঝখানে দ্বীপের আকারে জলটুঙ্গী ছিল বাদশা-জাদীদের গ্রীষ্ম বিলাসের প্রয়োজনে। আজ তার শুধু ভগ্নাবশেষই সম্বল। প্রকাণ্ড চাতাল তার প্রশস্ত সিঁড়ি নিয়ে কালো জলের অন্ত পর্যন্ত পেঁছে গেছে। নিস্তরঙ্গ সে জল—'ললিত ভুজের মৃণাল পরশে'র অভাবে অভিমানে নীরব। সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে নীচে নেমে আঁচলা আঁচলা জল নিয়ে, চোখ-মুখ শোধন করে নিলাম, দেখি যদি ৫০০ বছর পেছনে ফেলে আসা মুসলমানী রঙ-বেরঙ আর জৌলস-রোশনাই আমার চোখে ধরা দেয়। শেষ

ধাপে দাঁড়িয়ে নজর পড়ল, সিঁড়ির দুপাশের বাঁধান দেওয়ালের মাঝে একের পর এক খিলান ; ভেতরে তার অন্তহীন অন্ধকার। সম্ভবত জাহাজমহলের তলদেশ ভেদ করে ওপারের মুঞ্জতালাওএ গিয়ে মিশেছে। প্রমোদতরীর প্রেমিক-প্রেমিকা ভ্রমণের ছলে ওপার থেকে এপারে আসতে গিয়ে হয়ত একটু বেশি সময় নিতেন অন্ধকারের সুযোগে। বেসরম সঙ্গিনীরা পারে দাঁড়িয়ে হেসে গড়িয়ে পড়ত এ-ওর গায়ে, ওরই ছুতো ধরে। আবার হয়ত সুখনিশি অবসানে কোন অপ্রয়োজনীয়া সুন্দরী বৃন্ত থেকে খসে পড়ত অন্ধকারের অতলে, যার ব্যথার গভীরতা ঐ কালো জল আর পাষাণ ছাড়া কেউ বোঝেনি।

•

উপরে উঠে ধীরে ধীরে চললাম সামনের জাহাজ-মহলে। প্রায় চারশ' ফুট লম্বা আর পঞ্চাশ ফুট চওড়া জমি থেকে বত্রিশ ফুট উঁচু এ প্রাসাদ মুসলমান যুগ-সুলভ হাস্য, লাস্য, স্ফূর্তি ও রোমাঞ্চিত সৌন্দর্যের যোগ্য পীঠস্থান। প্রবেশপথের সামনে এসে থমকে দাঁড়ালাম হুশিয়ারীর অপেক্ষায়। পর পর তিনটি বড় বড় ঘর, মাঝে মাঝে বৃহৎ দরজা দিয়ে পরস্পরে সংযুক্ত। উত্তরের শেষে প্রস্ফুটিত পদ্মের মত হামাম। ধারে ধারে, ধাপে ধাপে নেমে গেছে সিঁড়ি তার তলদেশ পর্যন্ত। সন্তরণ পটিয়সীদের জন্য গভীর এবং অজ্ঞদের জন্য স্বল্পগভীর, দুরকমের নিরাপদ বিলাসের ব্যবস্থা রয়েছে এখানে। কত বিভিন্ন আকৃতি ও বিভিন্ন ভঙ্গিমায় পর পর সব ঘরের মধ্য দিয়ে চলেছে জলপ্রণালী—দক্ষিণদিকের প্রথম ঘরের পাশাপাশি ফারসি জলোত্তলন চক্রের ভগ্নাবশেষ পর্যন্ত। তার পাশ দিয়ে সিঁড়ি নেমে গেছে অতলছোঁয়া জল আর অন্ধকার খিলানের মধ্যে—ভূগর্ভ-ঘরের প্রবেশ দরজায়। সে দরজা আজ পাকাপোক্তভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে যুগে যুগে জমে ওঠা পুঞ্জীভূত পাপের ঠিকানা হারিয়ে ফেলার জন্য। ঘরে ফিরে এলাম। মাঝের ঘরে একেবারে মুঞ্জ

সরোবরের উপর একটি গুলতানী বৈঠকী বারন্দা, প্রাথমিক মুসলীম স্থাপত্য সুলভ গম্বুজ ঢঙের ছাদ আর দেওয়ালে হলদে এবং নীল মোজেক বা টালী দিয়ে নক্সা কাটা। মোজেক কারুকার্যের ইতিহাস খুঁজতে গেলে প্রথমেই মনে পড়ে প্রাগৈতিহাসিক যুগের কথা। সেদিনের মানুষ সম্ভবত তাদের সফল শিকারের আশায় তুক্ বা যাদুর প্রয়োজনে অথবা অবসর বিনোদনের জন্য তাদের ব্যবহৃত প্রাচীন অস্ত্রশস্ত্রে যে সব অলঙ্করণ করেছিলেন তাতে দেখা যায়, সুপরিকল্পিত ছিদ্র করে রঙ্-বেরঙের পাথর, ঝিনুক, হাড় ইত্যাদিকে নানারূপে বসিয়েছেন। সেই রূপকর্মই ক্রমে মধ্যযুগে মোজেক-শিল্পে পরিণত হয়েছিল। দামাস্কাসের মোজেকের কাজ "কফ্ত-গারী" করা তলোয়ার, তলোয়ারের খাপ্, ঢাকা ইত্যাদি সে যুগের বীরত্বের ও শৌখিনতার প্রতীক হয়ে উঠেছিল। অস্ত্রশস্ত্রের দেহে খাঁজ কেটে তাতে সোনা, রূপা বা তামার তার ঠুকে অলঙ্করণে অসামান্য খ্যাতিলাভ করেছিল দামাস্কাস ও সেখানের কারুশিল্পীরা। তারপর তৈমুরলঙ্ দামাস্কাস বিজয় করে এই বিখ্যাত অস্ত্রশিল্প ও শিল্পীদের সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করেন। ভারতবর্ষে মুসলমান যুগে, বিশেষ করে মোঘল সাম্রাজ্যে এই মোজেক-অলঙ্করণ চরম সাফল্যলাভে সমর্থ হয়েছিল। মাঝের ঘরের মত একই রকম বৈঠকী বারান্দা দু'পাশের ঘরেও আছে। পাশের ঘরের সরোবরমুখী দুটি বারান্দাই জাফরীকাটা মর্মরের জালি আঁটা, পর্দানসীন জানানাদের প্রয়োজনে। মুঞ্জ সরোবরের দিকে সারি সারি জানালা এবং মহল ও কাপুরতলাও-এর মাঝে বাগিচার সামনে সারিবদ্ধ দরজা। মাঝের উম্মুক্ত জানালায় এসে দাঁড়ালাম। সামনে প্রসারিত সংস্কারহীন মুঞ্জতালাও, তার উত্তর এবং পশ্চিমের ওপারে ভগ্নস্তূপ প্রাসাদশ্রেণী। তাদের এতদিনের নীরবতা যেন মুখর হয়ে আমার মনে ধরা দিল।

শাহেন-শাহ জাহাঙ্গীরের প্রেম-বিহ্বল চোখ সেদিনের এ রূপবতী

সরোবর যে রঙদার করে দিয়েছিল তা তিনি স্বীকার করেছেন তাঁর আত্মচরিতে। মোঘল-হারেমের অন্যতমা শ্রেষ্ঠ সুন্দরী নূরজাহান বেগম সেদিন সন্ধ্যায় এ প্রাসাদেরই বাসিন্দা ছিলেন (১৬১৬ খৃঃ অঃ)। এ ঘর, এ বারান্দা তখন ইরাক্-ইরাণের নক্সাদার কার্পেটে মোড়া ছিল,. মখমল মসলিন ও রেশমী পর্দার ভাঁজে ভাঁজে জৌলসদার হয়ে উঠেছিল পরিবেশ। সারেংগী ও সরাবের তালে তালে নৃত্যচপল হয়ে উঠেছিল নর্তকী, হাজার ঝাড়ের রোশনাইও নাখুশ করেছিল বেগম সাহেবার মেজাজ। নূরজাহান হুকুম করলেন, সারা মুঞ্জ ও কাপুরতালাও এবং তার আশেপাশের সব মঞ্জিলমহলে চেরাগ জ্বালিয়ে দেওয়ালীর রোশনাই বানাবার। বাদশাহ্ লিখছেন, 'সেদিনের সে মজলিস্ ছিল অপরূপ। সন্ধ্যায় দুই তালাও-এর কিনারে আর পাশের সব মহলে চেরাগমালা জ্বালিয়ে দিয়ে এল ওরা—এমন বুঝি আর কোথাও আর কখন ঘটেনি। বাতির রোশনাই আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল তালাও-এর জলে। রূপে, রসে, সুরে, সরাবে গুলজার হয়ে উঠেছিল এ মহ্ফিল্, পিপাসী সেদিন আকণ্ঠ পানে তৃপ্ত হয়েছিল।' প্রশস্ত ছাদের দুই প্রান্তে দুটিছত্রী বা হাওযাঘর; এক একটি আবার তিন ভাগে ভাগ করা। মাঝেরটির ছাদে গম্বুজ আর দুপাশের দুটি চারচালা—অনেকটা পিরামিড আকারের ছাদযুক্ত। তিনে মিলে বেশ সুন্দর স্থাপত্যছন্দ সৃষ্টি করেছে। নীচে বড় বৈঠকী বারান্দার উপরে এবং মাঝের ঘরের প্রবেশ দরজার উপর দু'টি হাওয়াঘর আছে। তার ছাদেও প্রাথমিক মুসলিম স্থাপত্যের গম্বুজ, ভেতরের দেওয়ালে হলদে, নীল মোজেকের কাজ এবং লতাপুষ্প অঙ্কিত ভিত্তিচিত্রের লুপ্তপ্রায় স্মৃতি আবছা হয়ে আছে। প্রাথমিক মুসলমান স্থাপত্যে বিশেষ করে মস্জিদে, হিন্দু বৌদ্ধ জৈন বা খৃষ্টীয় স্থাপত্যসুলভ পশুপক্ষী, নরনারী অথবা অন্য কোন প্রাণীর চিত্র বা ভাস্কর্য গঠন সম্ভব হয়নি। কারণ প্রাচীন হীনজানী বৌদ্ধ, জৈন ও কিছু ব্রাহ্মণ্য রীতির

মতো ইসলাম ধর্মেও কোন প্রাণীর চিত্রণ বা ভাস্কর্য গর্হিত কর্ম বলে নির্দেশিত হয়েছে। মুসলমান ধর্মমতে শেষবিচারের ক্ষণে, ক্ষুব্ধ দেবদূত ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা অর্থাৎ স্বর্গীয় সৃষ্টির অনুকরণ করার অপরাধে দোষী শিল্পীকে তার সৃজিত প্রাণীচিত্র বা ভাস্কর্যে প্রাণসঞ্চারের আদেশ দেবেন—যা মরজগতের কোন শিল্পীর পক্ষে সম্ভব হবে না, অতএব দোষমুক্তিও অসম্ভব। অগত্যা ইসলাম স্থাপত্যে জ্যামিতিক বা পত্রপুষ্প অথবা আক্ষরিক অলঙ্করণ ব্যবহার করতে হয়েছে। দিগন্তের প্রকৃতি কালের জীর্ণতা বক্ষে নিয়ে নবরূপে সজ্জিতা নায়িকার মত সমকালকে আহ্বান করছে ঋতুরঙ্গ রসে। বিন্ধ্যের গিরিশিখর একের পর এক ধাপে ধাপে ওঠানামা করতে করতে শীতের প্রভাতে কুহেলীর অবগুণ্ঠনে কুণ্ঠিতা।

জাহাজমহলের জাহাজী রমণীবল্লভ গিয়াস-উদ-দিন সমসাময়িক মুসলমান ঐতিহাসিকদের কাছে প্রায় আদর্শ চরিত্র ছিলেন। কারণ আজীবন তিনি ছিলেন বে-শরাবী ও একান্তই নমাজনিষ্ঠ। তবু অশীতিপর বৃদ্ধের সুদীর্ঘ রাজত্বকাল এবং বিকৃত বার্ধক্যের এ যুবসুলভ ইন্দ্রিয়-পরায়ণতা তার যুবকপুত্র নাসির-উদ-দিনকে ঈর্ষান্বিত করে তুলেছিল। নাসির-উদ-দিন দুবার বিফল হয়েও তৃতীয়বারে বিষপ্রয়োগে সফল হয়েছিলেন পিতৃহত্যায়। দুর্ভাগ্যবশত 'সৎচরিত্র' পিতার হত্যাকারী হিসেবে তিনি পরবর্তী সুলতান বাদশাহদের কাছে হয়ে পড়েছিলেন অত্যন্ত ঘৃণ্য। এমন কী মৃত্যুর কিছুদিন পরেও এর গুণাগারী দিতে হয়েছিল তাঁকে। জাহাঙ্গীর তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, 'শুনেছি আফগান শের খাঁর রাজত্বে তিনি নাসির-উদ-দিনের কবর দেখতে গিয়েছিলেন। যদিও শের খাঁ স্বয়ং খুব নিষ্ঠুর প্রকৃতির ছিলেন, তবু ঐ নাসির-উদ-দিনের গুণার শাস্তিস্বরূপ তিনি তাঁর লোকদের কবরের ওপর লাঠিপেটা করতে বলেন। আমিও যখন নিজে কবরটির কাছে গিয়েছিলাম তখন তার

ওপর বেশ কয়েকবার পদাঘাত করি। তারপর আমার পার্শ্বচরদের হুকুম করি তার ওপর লাথি মারতে। এতেও তৃপ্তি না পেয়ে আমি কবরটিকে ভেঙে ফেলে ঐ ঘৃণিত শবাবশেষ আগুনে ফেলে দিতে হুকুম করলাম। কিন্তু তখনই আমার মনে পড়লো অগ্নি তো সেই শাশ্বত জ্যোতিরই অংশ। তাকে ঐ নোংরা স্পর্শে অশুচি করা অন্যায়। তা ছাড়া আমি তার শবাবশেষ পোড়াতে আরও ইতস্তত: করেছিলাম পাছে এই শাস্তির ফলে দোজকের শাস্তি কমে যায়। অগত্যা আমি হুকুম করলাম তার ক্ষয়িষ্ণু শবাবশেষ নর্মদার জলে নিক্ষেপ করতে। কারণ শোনা যায় যৌবনে তিনি অত্যন্ত বদমেজাজী ছিলেন, ফলে সর্বদাই জলে পড়ে থাকতেন। প্রচলিত কাহিনী আছে একদিন তিনি শরাবে মত্ত হয়ে গভীর কালিয়াদহে (উজ্জয়িনী) যখন তাঁর শাহী-তসরিফকে নিক্ষেপ করেছিলেন তখন কয়েকজন খাস নোকর বহু কষ্টে চুল ধরে তাকে টেনে তুলতে সক্ষম হয়েছিল। চেতনা লাভ করে যেই তিনি শুনলেন যে তাঁর নোকররা তাঁকে চুল ধরে টেনে তুলেছে অমনি তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে হুকুম করলেন তাদের হস্তচ্ছেদের। পরে এ ঘটনার পুনরাবৃত্তিতে কেউ তাঁকে টেনে তুলবার সাহস না করায় তাঁর সলিলসমাধি হয়। আজ তাঁর মৃত্যুর ১১০ বছর পরও প্রচলিত কাহিনী যে তাঁর পচা দেহে এখনও নাকি জল শুকোয় নি।

নীচে নেমে পাশের হিন্দোলা-মহলের দিকে চলতে লাগলাম। জাহাজমহল ও কাপুরতালাও-এর মধ্যে গুলাববাগ দিয়ে পথ। কিছুদূর এগিয়ে পথের পাশে জমির উপর একটি ক্ষুদ্র মিনারিকার সামনে পেঁছিলাম। পাশে তার আগলহীন দরওয়াজা, তাকিয়ে দেখি গর্ভগৃহের সিঁড়ি অন্ধকারের মধ্যে এঁকে বেঁকে নেমে গেছে। তাকে অনুসরণ করে জমি থেকে প্রায় বিশ ফুট নীচে একটি অন্ধকার মধ্যমাকৃতি ঘরের মধ্যে এসে

পেঁছিলাম। এদিক ওদিক অন্য ঘরে যাওয়ার রাস্তা, কয়েকটিকে পাথর দিয়ে গেঁথে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, খোলাও আছে দু'একটা। পাশের ঘরে এলাম, খিলানের মধ্য দিয়ে পথ এগিয়ে গেছে পরের ঘরে। পৃথিবীর আলো ও পার্থিব প্রাণীর অপরিহার্য বায়ুর প্রয়োজনে ছাতের মাঝে মাঝে ছিদ্রসঙ্কুল মিনারিকা, রহস্যঘন অন্ধকারে ক্ষীণ আলোর ঝিকিমিকি আবহাওয়াকে ভয়াবহ করে রেখেছে। সম্ভবত জাহাজ-মহলের ভূগর্ভস্থ গৃহশ্রেণীর অংশবিশেষ এটি। গ্রীষ্মের প্রয়োজনে অথবা নিভৃত বিলাসের জন্য এর সৃষ্টি। সঙ্গী পাঁচসিকার বিজলীবাতির কাছে আর বেশী ভরসা না পেয়ে উপরে উঠে পড়লাম।

নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে হিন্দোলা-মহল একান্তই একা। বাইরের দিকে ব্যবহৃত গঠনরীতি, নীচের ন'-দশ ফুট চওড়া দেওয়াল ক্রমে ঢালুভাবে উপরে উঠে চার পাঁচ ফুটে দাঁড়িয়েছে। অথচ ঘরের ভেতর দিকে গাঁথুনি মেঝের সমকোণে উপরে উঠেছে। পাথরে গাঁথা প্রশস্ত মজবুত দেওয়াল বাইরের দিকে নীচের অংশ চওড়া, উপরে সরু। মাঝে মাঝে মোটা দেওয়ালকে আরও মজবুত করার জন্য একই ঢঙে নীচে চওড়া উপর সরু আরও প্রশস্ত এবং ভারী থামের শ্রেণী। সম্ভবত এর এই বিশেষ গঠনপ্রণালীর জন্যই রসিক স্রষ্টা নামকরণ করেছিলেন হিন্দোলা-মহল। বাড়িটির নক্সা ইংরেজি 'টি' অক্ষরের মত। মধ্যে উঁচু লম্বা সভাগৃহ এবং পাশে ছোট ছোট ঘরবিশিষ্ট দ্বিতল। উপরে উঠবার জন্য সিঁড়ির বদলে জমি থেকে ঢালু রাস্তা দোতলা পর্যন্ত পেঁছিছে। এ ধরণের বিশেষ ব্যবস্থার স্থানীয় নাম হাতীচড়াও। মনে হয়, শাহী-দরবারে যোগদান অভিলাষী পর্দানশীন বেগমসাহেবারা হাতী বা চতুর্দোলাযোগে যাতে একেবারে স্ব স্ব কক্ষে পেঁছিতে পারেন সেজন্যই এ ব্যবস্থা। রসিক স্থপতি এখানে তাঁর রসজ্ঞানের উৎকর্ষ দেখিয়েছেন সংযমের মাধ্যমে। অলঙ্করণের স্বল্প ব্যবহার প্রায় গোঁড়ামীর পর্যায়ে পড়েছে। গম্ভীর, প্রশস্ত ও গুরুভার

গঠনপ্রণালী যে যথেষ্ট রাজকীয় বৈশিষ্ট্য আনতে সক্ষম, এটি তার সার্থক প্রমাণ। হিন্দোলা-মহলের গঠনকাল গিয়াস-উদ্-দিনের সমকালীন, অর্থাৎ পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে বলে ধারণা করা হয়েছে।

ওখান থেকে বেরিয়ে হিন্দোলামহলের পশ্চিমদিকে মুঞ্জতালাও-এর উত্তর পাশে আরেকটি রাজকীয় প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষে এসে হাজির হলাম। এদিক ওদিক ঘুরতে ঘুরতে প্রত্নতত্ত্ববিভাগের নির্দেশনামা নজরে পড়ল। প্রাসাদটির নাম তাইখানা এবং চম্পাবাওড়ী, পাশেই ভূগর্ভের অন্তর্গামী সিঁড়ি বেয়ে নিচের একটি প্রশস্ত কক্ষে পেঁছিলাম। বড় বড় খিলানের উপর ছাত তার উপরে মাটি, মধ্যে মধ্যে আলো ও হাওয়াবাহী সছিদ্র মিনারিকা। এ ঘর থেকে পর পর অনেক ঘর পেরিয়ে পথ চলে গেছে মুঞ্জতালাও-এর পশ্চিম পারে আর একটি ভগ্নপ্রাসাদে এবং মাণ্ডুর প্রথম ইস্‌লামিক স্থাপত্য দিলওয়ারা মসজিদের ভগ্নাবশেষ পর্যন্ত। দিল্লীর সুলতান মহম্মদ শাহ্ তুগলক (১৩৮৯-৯৪ খৃঃ অঃ) কতৃক নিযুক্ত স্থানীয় প্রধান দিলওয়ার খাঁ ঘোরী ১৪০১ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর সম্বন্ধ ত্যাগ করে মালবের প্রথম স্বাধীন সুলতান হন এবং ধারানগরী ছিল তাঁর রাজধানী। তাঁরই নির্মিত এ মসজিদ-গাত্রের লিখিত বিবৃতি থেকে জানা যায় এর নির্মাণকাল ১৪০৫ খৃষ্টাব্দ। ঘুরতে ঘুরতে আবার সেই প্রশস্ত কক্ষে ফিরে এলাম, কানে এল নারীকন্ঠ কাকলী এবং অলঙ্কার কিঙ্কিনী। বুঝি সত্যই কোনো বিস্মৃতদিনের বাদশাজাদী কবর ছেড়ে উঠে এসেছে বর্তমান এই কলাকারের সঙ্গে মহব্বৎ করতে। রোমাঞ্চিত দেহে গোলকধাঁধার পথে পাড়ি দিলাম। ঘুরে ফিরে বারে বারে সেই একই ঘরে ফিরে আসি, আবার এগোতে শুরু করি আওয়াজ লক্ষ্য করে। পথপ্রান্তে আবছা আলো ঝিকিমিকিয়ে উঠল। দ্রুত পদক্ষেপে এক বিচিত্র জায়গায় এসে পড়লাম, বহু উঁচুতে চক্রাকার উন্মুক্ত পথে সকালের আকাশ উঁকি মারছে। নিচে গোলাকার গভীরতা, চারিদিকে পাথরের বন্ধনী পথের সীমা

নির্দেশরত। বন্ধনীর পাশে এসে দাঁড়িয়ে দেখি নিচের গভীরে জল চিক্‌চিক্ করছে, তার পাশে স্নানরতা কয়েকটি নারী মনমাতানো রঙীন পোশাকে আবৃতা কেউ, কেউবা বিস্রস্তবেশা। আমার আবির্ভাবে সচকিতা হয়ে মৃগনয়ন সরমে জলমুখী হল। লজ্জিত হয়ে সরে এলাম সেখান থেকে। ক্ষণিক নিস্তব্ধে কাটিয়ে মনস্থির করে ফেললাম—দেখাই যদি পেলাম তবে সান্নিধ্য কেন পাব না। আবার সেই আঁখ-মিচৌলি। অনেক ঘোরাফেরা অনেক চেষ্টাচরিত্রের পর আবিষ্কার করলাম পথ নিম্নগামী। অন্ধকার ভেদ করে ক্ষুদ্র বিজলীবাতির ভরসায় এগিয়ে চলেছি হুরীর সন্ধানে, ঐ ত' কাকলী-কিঙ্কিনী। দ্রুত, আরও দ্রুত পদক্ষেপে জলকিনারে পেঁছিলাম। এই তবে চম্পাবাওড়ী। চম্পাবতী রাজকন্যা দেখি আবার ফাঁকি দিয়েছে। প্রাণের কোন চিহ্ন নেই, প্রমাণ শুধু জলরেখা পথ বেয়ে হারিয়ে গেছে আঁধারে। উপরে তাকালাম, উঁচুতে বাওড়ী বা ইঁদারার উন্মুক্ত প্রান্তদেশ, সেখানে আকাশের স্পর্শ। তার নিচে ধাপে ধাপে ঘিরে রয়েছে তাইখানা। আমি প্রায় পঞ্চাশ ফিট নিচে জলের ধারে দাঁড়িয়ে রয়েছি একা, খানিক আগেই যেখানে হয়েছিল সুন্দরী সমাবেশ। ছলনাময়ীদের হাস্য-লাস্য অস্পষ্ট হয়ে আসছে দূরে, বেশী দেরী করলে রহস্য উদ্ঘাটন সম্ভব হবে না। দ্রুত জলচিহ্ন অনুসরণ করে এগিয়ে চললাম। একবার পথ হারাই আবার গভীর অন্ধকারে ক্ষীণ দৃষ্টি বিজলীবাতির কুহেলিকায় আবিষ্কার করি পথ। কখনও কাছে কখনও দূরে রসিকাদের হাসি আমাকে আহ্বান করে।

ভাববিহ্বল অন্যমনস্ক মন চমকিত হল মুঞ্জতালাও-এর জলস্পর্শে। পথ কি তবে অতলগামী? পাতালকন্যা অনুসরণে সরোবরে তলিয়ে যেতে হবে নাকি! দ্বিধাগ্রস্তমনে কর্মপন্থা চিন্তা করছি, মাথার উপরে মুঞ্জতালাও-এর পাড়ে যেন কারা হেসে উঠল আমার বেওকুফিতে। ভগ্ন পথ বেয়ে উপরে উঠলাম। সেখানে কয়েকজন ভীল মরদ ও আওরৎ

প্রত্নতত্ত্ববিভাগের সংস্কারকর্মে নিযুক্ত। ব্যর্থ রোমাঞ্চে ভারাক্রান্তমনে ধীর পদক্ষেপে চলতে শুরু করলাম। পেছনে কলকণ্ঠের উচ্ছ্বসিত হাসি আমার গতিরোধ করল, ফিরে দেখি ভিল্‌নীরা হেসে গড়িয়ে পড়ছে এ ওর গায়ে, জিজ্ঞাসুনেত্রে মরদরা তাকিয়ে আছে ওদের দিকে।

চলতে চলতে উত্তরে আর একটি সুরক্ষিত তোরণ পেরিয়ে এলাম। নির্দেশনামা পড়ে দেখি হাতীপোল দরওয়াজা, পাশেই এ নামকরণের কারণও খুঁজে পেলাম। তোরণের দু'পাশে সওয়ারীসহ দুটি হস্তীমূর্তি, হিন্দুভাস্কর্যের মত পাথর কেটে এগুলো তৈরী নয়, গেঁথে বানিয়ে তার ওপর অস্তর করা হয়েছে, বর্তমানে জীর্ণদশা। দুপাশে দ্বাররক্ষীদের ঘর এবং একটি ঢাকা পথের সংযোগ আছে এ ঘরের মধ্যে। মাণ্ডুর অন্যান্য তোরণ থেকে এর স্থাপত্যের তফাৎ নজরে পড়ল, খিলানের ঢঙ্ প্রাথমিক মুসলিম রীতির চেয়ে মোঘল রীতিরই ঘনিষ্ঠ। তাছাড়া পাশেই রয়েছে কামান বসাবার আসন—যা প্রথম যুগের স্থানীয় সুলতানদের অজ্ঞাত অস্ত্র। সম্ভবত এর নির্মাণকাল আকবর কর্তৃক দুর্গজয়ের পর ; ১৫৬৪ খৃস্টাব্দে অথবা ১৫৯৮ খৃস্টাব্দে তাঁর এখানে দু'বার অবস্থানের কোন এক সময়ে অথবা জাহাঙ্গীরের মাণ্ডু বসবাসের কালে। কিম্বা যুবরাজ খুররম (শাহ্‌জাহান) যখন পিতা জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে ১৬২৫ খৃস্টাব্দে এখানে পালিয়ে এসেছিলেন, হয়ত তখনই আত্মরক্ষার বিশেষ প্রয়োজনে এর উৎপত্তি।

দুপাশে ভগ্ন প্রাসাদের স্তূপ, বন্যতায় আবৃত হয়ে গেছে সব, ভেতরে যাওয়া মুশকিল। আশেপাশে নামধাম লিখিত নির্দেশনামা রয়েছে। কোথাও না থেমে এগিয়ে চলেছি প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের দপ্তরের ঠিকানায়। পথ এসে পেঁাছেছে কালকের সেই প্রথম চেনা গ্রামের মাঝে। সেখানে রাস্তার ধারে, কাঁচা দোতলা বাড়িতে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের কার্যালয়। দপ্তরখানায়

একজন কর্মরত মারাঠী ভদ্রলোকের দেখা পেলাম। তাঁকে জানালাম, মাণ্ডু দুর্গের তত্ত্বাবধায়ক পণ্ডিত শ্রীবিশ্বনাথ শর্মার সঙ্গে আলাপের উদ্দেশ্যে আমি এখানে এসেছি। পাশে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে গেলেন তিনি। একটু পরে উপরে যাবার আহ্বান এল। প্রশস্ত ঘর, একপাশে ফরাস পাতা, তার উপরে লেখার চৌকি ও কয়েকটি তাকিয়া। সামনে রয়েছে কিছু জীর্ণ চেয়ার ও বেঞ্চ। দেওয়ালের গায়ে বই ও কাগজপত্র ঠাসা কয়েকটি আলমারী, আর তার ফাঁকে ফাঁকে বোম্বাই ঢঙে, জল ও পোস্টার রঙে আঁকা মাণ্ডুর নিসর্গ-চিত্র এবং মাণ্ডু দর্শনরত বিখ্যাত রাজনীতিকদের ফটোগ্রাফ। মারাঠী ভদ্রলোক নীচে নেমে গেলেন, আমিও সেই সুযোগে আলমারীর বইগুলিতে উঁকিঝুঁকি দিতে লাগলাম। হ্যাভেল, ফার্গুসন, গ্রিফিথ, ব্রাউন, ইয়াজদানীর বেশ কিছু খ্যাতনামা এবং দুষ্প্রাপ্য লোভনীয় বই রয়েছে সেখানে। গুরুকণ্ঠের বিশুদ্ধ হিন্দীতে আকৃষ্ট হয়ে পেছনে ফিরলাম। দেখি, দীর্ঘদেহী বলিষ্ঠ এক ভদ্রলোক সাদাসিদা পোশাকে দাঁড়িয়ে মৃদুকণ্ঠে বলছেন,—'বসুন, কি দিয়ে খাতির করি আপনাকে।' প্রত্যভিবাদন করে ইংরাজীতে বললাম,—'সম্ভবত, আমি পণ্ডিতজীর সঙ্গে কথা বলছি? আমি একজন বাঙ্গালী, কিন্তু ভুল হিন্দী না বলে অশুদ্ধ ইংরাজীতে কথা বলছি, দেশীয় ভাষার অজ্ঞতা ক্ষমা না পেলেও বিদেশী ভাষার অজ্ঞানতা ক্ষমাযোগ্য সেই ভরসায়।' ইংরাজীতে উত্তর দিলেন— 'কি সৌভাগ্য আমার, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দেশবাসী আপনি, আপনার যোগ্য খাতির যে আমার চিন্তাতীত।' নিজের ক্ষুদ্রতা আমাকে বিচলিত করল—মহৎ এ দুই বঙ্গসন্তানের এ কি দীন প্রতিনিধি আমি। বিনীত হয়ে জানালাম, 'এভাবে আমাকে লজ্জা দেবেন না, ঘটনাচক্রে আমি ওঁদের স্বদেশীয়, নিতান্তই স্বল্পজ্ঞানী চিত্রকর আমি, কোন যোগ্যতাই আমার নেই ওঁদের প্রতিনিধিত্ব করবার। আপনার মনের রত্নসাগর থেকে দু' একটি উপদেশ যদি আমাকে দান করেন ত' চিরকৃতজ্ঞ

থাকব।' আমার বিনয়কে ভূমিসাৎ করে ভদ্রশ্রেষ্ঠ উত্তর দিলেন—'আপনার বিনয়ই আপনার যোগ্যতার প্রমাণ, শুধু বাঙ্গালী বলেই নয়, একজন সৃজনশীল শিল্পী হিসেবেও আপনি আমার বিশেষ সম্মানীয় অতিথি। উপদেশের যোগ্যতা আমার কোথায়, তার চেয়ে আসুন, এখানে আপনার প্রবাসের দিনগুলিতে আলোচনা করে পরস্পরের অজ্ঞতা দূর করি।'

কৃতার্থ হয়ে বসলাম, ইতিমধ্যে এক ছোকরা প্রকাণ্ড এক বাটি গরম দুধ এনে হাজির করেছে। পণ্ডিতজী বললেন, 'চা এখানে দুষ্প্রাপ্য, অতএব দুধেই তৃষ্ণা মেটাতে হবে।' দ্বিরুক্তি না করে প্রায় সেরখানেক দুধ একচুমুকেই মেরে দিলাম। মনে মনে ভাবলাম, সকালবেলা রোজ পণ্ডিতজীর সঙ্গে দেখা করতে এলে প্রাতরাশের পয়সাটি বাঁচান যাবে দেখছি। তারপর উনি মাণ্ডুর নানা স্থানের কিছু ফটো আর কিছু আঁকা ছবি বার করে দেখাতে লাগলেন। ছবিগুলির কয়েকটি বোম্বাই-এর চিত্রবিদ্যালয়ের ছাত্রদের কাজ, আর কিছু উজ্জয়িনী এবং ধারার চিত্রবিদ্যালয়ের ছাত্রদের। তবে সেগুলির রঙ-ঢঙও বোম্বাই সমগোত্রীয়। দেখে মনে হল, ঐসব চিত্রবিদ্যালয়ের বেশীর ভাগ শিক্ষকই বোম্বাই বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র। যদিও মধ্যভারতের শহরে ও গ্রামে মধ্যযুগের রাজপুত, মালব ও মোঘল কলমে আঁকা চিত্র ও চিত্রকর এখনও একেবারে লুপ্ত হয়ে যায়নি, তাছাড়া, স্থানীয় রাজকীয় ও সরকারী সংগ্রহশালায় রাজপুত, মোঘল এবং এখানকার মালব লোকশিল্পের সংগ্রহ যথেষ্ট আছে; তবু কিভাবে বোম্বাইসুলভ পাশ্চাত্যের ব্যবহারিক শিল্পকর্ম স্থানীয় শিক্ষিত শিল্পীদের এত প্রভাবান্বিত করল ভেবে পেলাম না। পণ্ডিতজীর কাছে জানলাম, বোম্বাই ও আশেপাশের শহর থেকে যথেষ্ট দর্শক প্রতিবছরই এখানে আসেন। কিন্তু স্থানীয় স্থাপত্য বা মালবশৈলীর চিত্র তাদের বিশেষ কিছু প্রভাবান্বিত করেছে বলে মনে হ'ল না; বরং বিপরীতই দেখলাম। রৌদ্রস্নাত চড়া রঙ এবং কড়া আলোছায়ার দ্বন্দ্বের বদলে, বিদেশী

সাময়িকপত্রের বিজ্ঞাপন মার্কা ঘোলাটে, ধোঁয়াটে অথবা আন্দাজি রঙে আঁকা নিসর্গ-চিত্র মনে বিরূপ ভাবের উদ্রেক করলো।

ক্রমে পণ্ডিতজী স্থানীয় ইতিহাস আলোচনা আরম্ভ করলেন সম্প্রতি তিনি যথেষ্ট হিন্দু, জৈন ও কিছু বৌদ্ধ মূর্তি স্থানীয় মসজিদে ও মহলে ব্যবহৃত পাথর থেকে বিকৃত ও অবিকৃত অবস্থায় আবিষ্কার করেছেন। জাহাজ-মহলের কাছে, দুর্গপ্রাচীরের নীচে, পর্বতের গায় একটি অসামাপ্ত গুহাশ্রেণীও আবিষ্কৃত হয়েছে। তা' ছাড়াও, ধারারাজ মুঞ্জের নামানুসারে মুঞ্জতালাওএর নামের সাদৃশ্য, এসব প্রমাণ সহযোগে মাণ্ডুদুর্গের নির্মাণকাল ধারণা করা সম্ভব হয়েছে। স্থিরভাবে বলতে না পারলেও এসব মূর্তি ও অলঙ্করণের রীতি অনুসরণে আধুনিক প্রত্নতাত্ত্বিকেরা গুর্জরপ্রতিহার রাজাদের সমকালে মাণ্ডুদুর্গের প্রারম্ভ অনুমান করেন। দ্বিপ্রহর আগত দেখে ফেরার প্রস্তাব করলাম। পণ্ডিতজী অনুরোধ করলেন, মধ্যাহ্ন বিশ্রামের পর যেন রেস্ট হাউসে অপেক্ষা করি, বিকালে ওঁর টাঙ্গায় একসাথে ঘুরতে বেরোনো যাবে।

বিকালে মধ্যযুগ-সুলভ ঔদ্ধত্যের প্রতীক সুসজ্জিত সবল অশ্বচালিত ছোট টাঙ্গা চালিয়ে শর্মাজী এলেন। এক সঙ্গে চা-পান সমাপ্ত করে বেরিয়ে পড়লাম মাণ্ডু দেখতে। প্রথমে এলাম মালবের প্রথম স্বাধীন সুলতান দিলওয়ার খাঁ ঘোরীর পুত্র অল্ফ্ খাঁর, যাঁর সুলতানী নাম হোসঙ্গ শা ঘোরী, (১৪০৫—৩২ খৃঃ অঃ) মাজার বা স্মৃতিসৌধে। মালবের সুধী ও শ্রেষ্ঠ সৃজনশীল সুলতান হোসঙ্গই তাঁর রাজধানী ধারা থেকে মাণ্ডুতে পরিবর্তন করেন এবং সেখানে ইসলামী শিল্প-স্থাপত্য ও শাস্ত্রালোচনার এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি করতে সমর্থ হন যে, সমসাময়িককালে ইসলাম সংস্কৃতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র বলে স্বীকৃতি পেয়েছিল মাণ্ডু। শ্বেত মর্মরে নির্মিত এ স্মৃতিসৌধ, কাল তার বর্ণশুচিতা হরণ করেছে। গম্বুজশোভিত চতুষ্কোণ তোরণদ্বার পেরিয়ে প্রশস্ত প্রাঙ্গণে এসে হাজির হলাম। পশ্চিমপাশে লম্বা

বারান্দা ও ঘর, মধ্যে উঁচু চাতালের উপর চতুষ্কোণ স্মৃতিসৌধ, ঊর্দ্ধে বৃহৎ প্রাথমিক মুসলমানী গম্বুজ, তার চারকোণে অপেক্ষাকৃত ছোট আকারের আরও চারটি। নিরাভরণ চাতালের চারপাশে হিন্দু স্থাপত্যরীতির অলংকৃত বন্ধনীর দ্বারা রূপায়িত। সেখান থেকে উঠেছে সাড়ে-একত্রিশ ফুট উঁচু দেওয়াল তার উপরে হস্তীদন্তরূপী ব্র্যাকেট এবং কার্নিশ। তারপর অলঙ্কৃত খিলানশ্রেণী ও বন্ধনীসমষ্টি এবং সবার উপরে গম্বুজ। সৌধের প্রধান প্রবেশ দরওয়াজাকে ঘিরে আছে অর্ধ-উন্মিলিত পদ্মশোভিত দড়ির মত বন্ধনী, তার দু'পাশে জাফরিকাটা মর্মর-জালি এবং এদিকে ওদিকে মোজেকের কাজ করা নীল তারা। চারপাশের মর্মর-জালি সৌধের অন্তর্দেশে মৃদু আলোকসম্পাত করে সৃজনধর্মী দিগ্বিজয়ী সুলতান হোসংগ-এর অনন্ত ঘুম প্রশান্ত করেছে। অন্দরমহলের নক্সা নীচে চতুষ্কোণ, তারপর অষ্টকোণ, শেষে ষোড়শকোণ। গুরুভার বৃহৎ গম্বুজের ভারসাম্য রক্ষার প্রয়োজনে এই গঠনপ্রণালী। সুলতানের কবর শুভ্র মর্মরখচিত, তা'তে স্বল্প হিন্দু ও মুসলমানী অলংকরণ, আভরণহীন এ শুচিতা স্থানযোগ্য গাম্ভীর্য রক্ষার সহায়ক হয়েছে।

পূর্বভূখণ্ডের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এ স্মৃতিসৌধ যে পরবর্তী যুগেও স্থপতি ও শিল্পীদের অভিভূত করেছিল তার প্রমাণ এখানে দক্ষিণ-দ্বারের পাশে মর্মরফলকে ফারসী ভাষায় লিখিত রয়েছে—

> "ব তারীখ নহিম সন্ হজার ও হফ্তাদ হিজরী
> ফকীর হাফীজ লুৎফুল্লাহ মহিনদিস্ ইবন্
> উস্তাদ এহমদ মেমার শাহজঁহা নী ব খাজা যাদুরায়,
> ব উস্তাদ শিবরাম ব উস্তাদ হামিদ, ব জেহত জিয়ারৎ
> আমদাবুদ দো কলেমা য়াদগার ন বিস্ত।"

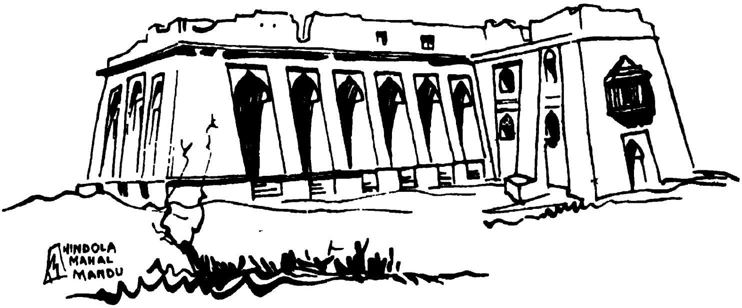
অর্থাৎ ১০১৭ হিজরীতে (১৬৫৯ খৃষ্টাব্দ) ফকির হাফীজ লুৎফুল্লাহ মহিনদিসের পুত্র ওস্তাদ এহমদ মেমার শাহজহাঁ, খাজা যাদুরায়, ওস্তাদ

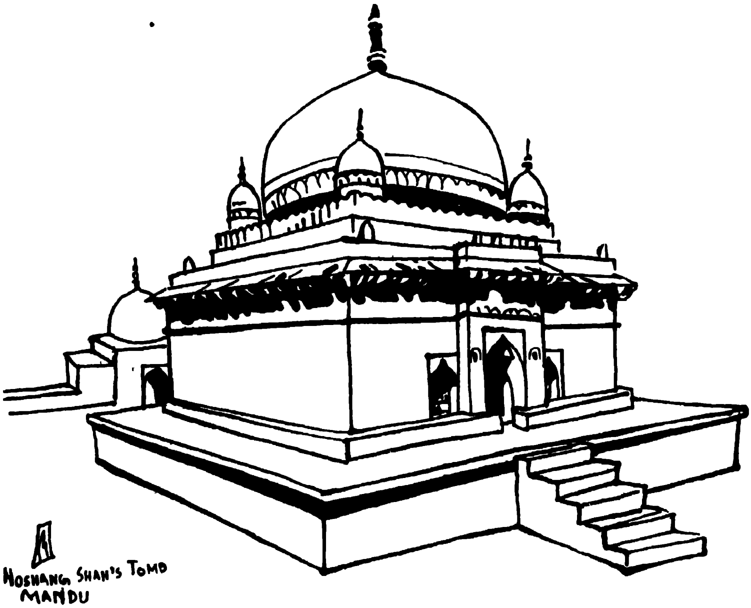




উপরে—সোনগড়

নীচে—নিসর্গ চিত্র (মাণ্ডু)





উপরে—হিন্দোলা মহল নীচে—হোসঙ্গ শা ঘোরীর স্মৃতিসৌধ

শিবরাম এবং ওস্তাদ হামিদ এ পবিত্র সৌধ দর্শনাভিলাষে এখানে এসেছিলেন এবং রচনা করে গেছেন তারই স্মারক এ শিলালিপি। সম্রাট সাহ্‌জাহান দরবারের চারজন যোগ্য স্থপতি ও শিল্পী এঁরা। বিশেষ করে, তাজস্রষ্টার ঘরওয়ানা অধিকারী লুৎফুল্লাহ পুত্র এহমদ। কারণ, হাফীজ লুৎফুল্লাহ মহিনদিস তাঁর রচিত দেওয়ান-ই-মহিনদিস্‌-এ লিখেছেন, তাঁর পিতা শিল্পীশ্রেষ্ঠ ওস্তাদ আহমেদ লাহোরী নয়দির-উল-আশার মমতাজ-মহল স্মৃতিসৌধ, দিল্লীদুর্গ ইত্যাদির স্রষ্টা (কিন্তু হ্যাভেল ইত্যাদি মনীষীদের মতে 'সিরাজের' ওস্তাদ মহম্মদ ইসা আফান্দি তাজমহলের স্রষ্টা) এবং ওস্তাদ হামিদও আগ্রার তাজমহলের অন্যতম কৃতী শিল্পী। এখানে এঁদের আগমন হয়েছিল পূর্বসূরীকে শ্রদ্ধা জানাতে। স্মৃতিসৌধ থেকে পশ্চিমের বারান্দায় এলাম। সারি সারি হিন্দু বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্তম্ভশোভিত লম্বাকৃতি বারান্দা এবং পাশের লম্বা কক্ষ। কক্ষের স্থাপত্য ইসলামী রীতির উপরে অর্ধগোলাকার গম্বুজধর্মী ছাদবিশিষ্ট। এইখানে সংগৃহীত রয়েছে বিভিন্ন রীতির প্রত্নতাত্ত্বিক বিশেষত্বপূর্ণ সামগ্রী, যেমন মুঞ্জতালাও-এর উত্তর-পশ্চিম তীরে দিলওয়ারা মসজিদ ও নাহারঝরোখা বারান্দা এবং সাগরতালাও-এর তীরবর্তী সুলতান মহম্মদ খিলজীর পিতা মালিক মঘিৎ নির্মিত মসজিদ (১৪৩২ খৃঃ অঃ) ইত্যাদি জায়গা থেকে জোগাড় করা হিন্দু, জৈন, বৌদ্ধ মূর্তি ও ভাস্কর্য এবং মুসলমানী মোজেক, রঙীন টালী ইত্যাদি। এই-ই স্থানীয় সংগ্রহশালা।

সাড়ে পাঁচশ বছরের প্রাচীন এ স্মৃতিসৌধ আজও সম্পূর্ণ অটুট রয়েছে। যে বিশেষ মালমশলা ও কারিগরীর সাহায্যে তা সম্ভব হয়েছে তার কিছুটা আন্দাজ পাওয়া যায় শ্রীযদুনাথ সরকার মহাশয়ের কাছ থেকে। সরকার মহাশয় যখন আওরঙ্গাবাদে রাওজা রবিয়া-উদ-দুরানী বা আলমগীর-মহিষীর স্মৃতিসৌধ দেখতে গিয়েছিলেন তখন সেখানে গল্প

শুনেছিলেন—দাক্ষিণাত্যের এ 'তাজ' সৃষ্টির প্রয়োজনে দিল্লী, আগ্রা থেকে মূল তাজ শিল্পীগোষ্ঠীর বংশধরদের আমন্ত্রন করা হয়। শিল্পীরা মোটা পারিশ্রমিক অগ্রিম নিয়ে সাজ-সরঞ্জাম, মশলাপাতি সংগ্রহ করে আওরঙ্গাবাদে পেঁাছে কাজ শুরু করলেন। কিছুদিন নিয়মিত কাজ চলার পর হঠাৎ একদিন সজাগ আওরঙ্গাবাদের নাগরিকেরা আবিষ্কার করলেন, কর্মরত সব শিল্পীস্থপতিরা বমাল উধাও হয়েছেন। চারিদিকে খোঁজ খোঁজ রব উঠল, কিন্তু এদিকে সৌধের কাজ স্থগিত। বছরের পর বছর কাটে, তাঁদের আর খোঁজ নেই। দেখতে দেখতে দশ বছর কেটে গেল, তারপর যেমন হঠাৎ একদিন শিল্পীরা উধাও হয়েছিলেন তেমনই হঠাৎ একদিন তাঁদের আবির্ভাব ঘটল। সকালে দেখা গেল, কর্মক্ষেত্র আবার কর্মচঞ্চল, শিল্পীরা খুব মনোযোগ সহযোগে যে যাঁর কাজ করছেন। বাদশাহের স্থানীয় প্রতিনিধি হুকুম দিলেন, তাঁদের জবাবদিহি হাজির করতে। নির্বিকার শিল্পীগোষ্ঠী জানালেন, তাঁরা যখন চোর বা জুয়াচোর হিসাবে বাদশাহী কর্মে নিযুক্ত হননি তখন এ সন্দেহ অবান্তর, শিল্পী বা স্থপতি হিসেবে যোগ্য দায়িত্ব বুঝেই তাঁরা কর্ম গ্রহণ করেছেন, স্থাপত্যগত প্রয়োজনেই এ অনুপস্থিতি। মালমশলার দৃঢ়বন্ধন কালজয়ী করতে হলে প্রয়োজন তাদের যোগ্য সংমিশ্রণ এবং তারপর ঐ মিশ্রিত মশলার অন্তত দশ বছর মৃত্তিকাগর্ভে নিরবচ্ছিন্ন বিশ্রাম; তবেই সম্ভব হবে আবশ্যকীয় রাসায়নিক প্রক্রিয়া যা তাকে প্রাকৃতিক ক্ষয় থেকে যুগ যুগান্ত রক্ষা করবে। তারপর শিল্পীরা মাটি সরিয়ে সেই মিশ্রিত মালমশলা বার করে তাঁদের কথার সত্যতা প্রমান করলেন এবং যথারীতি সৌধনির্মাণ কর্মে অগ্রসর হলেন।

হোসঙ্গ স্মৃতিমন্দির থেকে বেরিয়ে পাশের জামা-মসজিদের দিকে এগোতে লাগলাম। মুসলমান ধর্মমন্দির, মসজিদের গঠনপ্রণালী

ধর্মানুশাসনে সীমাবদ্ধ। প্রার্থনাকারীর প্রাথমিক কর্ম ওয়াজু বা শুচিধৌতির প্রয়োজনে সাধারণত প্রাঙ্গণে থাকে শৌচব্যবস্থা, তারপর ভিতরে থাকে মিম্বার বা উচ্চাসন, যেখান থেকে ইমাম বা ধর্মযাজক তাঁর কুৎবা অর্থাৎ প্রার্থনাস্তোত্র বাণী দান করেন। মিম্বার সাধারণত তিন ধাপ বিশিষ্ট হয়, তবে রাজকীয় মসজিদের রাজকীয় ব্যবস্থা। পশ্চিম দেওয়ালের মধ্যে থাকে মিরাব, সম্ভবত এই গঠনপ্রণালীটি সংগ্রহ করা হয়েছে খৃষ্টীয় ধর্মমন্দির থেকে, সেখানে খৃষ্ট বা খৃষ্টভক্তদের প্রস্তর মূর্তি বসাবার প্রয়োজনে দেওয়ালের মধ্যে যে খিলানঢঙের বৈঠকী ব্যবস্থা থাকে তারই অনুসরণে হয়ত মসজিদে মিরাবের উপস্থিতি। মসজিদের কক্ষ হবে অবিভক্ত এবং বৃহৎ, কারণ হিন্দু বা ইসলামীসুফী-সুলভ ব্যক্তিগত প্রার্থনার বদলে সঙ্ঘবদ্ধ প্রার্থনাই ইসলামের নির্দেশ। মক্কাস্থিত প্রধান মুসলমান ধর্মমন্দির ভারতের পশ্চিমে, তাই পশ্চিম দেওয়ালের মধ্যস্থলে থাকে মিরাব এবং কাবা নির্দেশক কেবলা। পশ্চিম দেওয়াল হবে নিরন্ধ্র, কারণ ঈশ্বর প্রার্থনারত ভক্তমন যাতে রন্ধ্রপথদৃষ্ট কোন বস্তু বা প্রাণী দ্বারা অন্যমনস্ক না হয়ে পড়ে। যদিও মসজিদে গম্বুজ বা মিনার ধর্মগত অবশ্য প্রয়োজনীয় নয় তবুও মোয়াজ্জিনের আজান দেওয়ার প্রয়োজনে তা অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছে। তাজমহলের দর্শক নিশ্চয়ই লক্ষ্য করে থাকবেন, তাজের বাগানে, পশ্চিম এবং পূর্বদিকে, একই স্থাপত্যরীতির দুটি মসজিদ আছে। পশ্চিমের মসজিদটি নিয়মিত ব্যবহার হয়, কিন্তু পূর্বদিকের মসজিদটি অব্যবহৃত, কারণ এ মসজিদের পশ্চিম দেওয়ালে রয়েছে তার প্রবেশপথ, অতএব ধর্মগতভাবে অব্যবহার্য। যদিও স্থাপত্য সৌন্দর্য ও সামগ্রিক ভারসাম্যের প্রয়োজনে এর অবস্থান অবশ্যম্ভাবী। এটি পশ্চিম মসজিদের জবাব।

জামা মসজিদের গঠন শুরু করেন সুলতান হোসঙ্গশাহ্ এবং শেষ করেন (১৪৫৪ খৃঃ অঃ) মহম্মদ শাহ্ খিলজী, যিনি হোসঙ্গ-পুত্র

মহম্মদ শাহ্ ঘোরীকে বিষপ্রয়োগে নিহত করে (১৪৩৬ খৃঃ অঃ) মান্ডুর সুলতানী দখল করেন। সুলতান হোসঙ্গ সবদিক থেকে শ্রেষ্ঠ ও বৃহৎরূপে জামা মসজিদের পরিকল্পনা করেছিলেন। সম্ভবত মূল পরিকল্পনা দামাস্কাসের বৃহত্তম মসজিদের অনুকরণে প্রস্তুত। তিনশ ফুট বাহুবিশিষ্ট চতুর্বাহু এ মসজিদ, জমি থেকে পনের ফুট উঁচু তার ভিত্। হিন্দু-মন্দিরদ্বারের পরিকল্পনা ও কারুকার্যে অনুপ্রাণিত বিরাট তোরণ এবং সঙ্গের বারান্দা মর্মর মোজেকের সূক্ষ্ম অলঙ্করণে সজ্জিত, মহাকালের স্পর্শ লেগেছে সেখানে। তিরিশটি রাজকীয় সোপান অতিক্রম করে, গম্বুজশোভিত লম্বা বারান্দা পেরিয়ে বৃহৎ প্রার্থনাকক্ষে হাজির হলাম। বিশাল এ পরিবেশ দর্শকমনকে সম্পূর্ণ অভিভূত করে তার সংযমে, সৌন্দর্যে ও গাম্ভীর্যে। প্রার্থনাকক্ষের ভিতর থেকে মধ্যের প্রশস্ত প্রাঙ্গণের দিকে তাকালাম, খিলানের ফাঁকে খিলান, তার ফাঁকে আরও খিলান, তারপর স্তম্ভসারি। চারিদিকে অলঙ্কারবিহীন সংযত স্থাপত্যে, শ্রেণীবদ্ধ ঊর্ধ্বরেখার মধ্যে কখন যে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছি জানতে পারিনি। আলোছায়ার ঝিকিমিকি ও কালোছায়ার রহস্য, গগণেন্দ্রনাথ চিত্রিত রহস্যবাদকে স্মরণ করিয়ে দিল। দু' পাশের দেওয়ালে মর্মরজালি, তার উপর মোজেকের কাজ করা নীল-তারা অসীমের স্পর্শ এনে দিয়েছে। পশ্চিমের রন্ধ্রহীন দেওয়াল, তা'তে পর পর সতেরটি মিরাবে প্রাথমিক মুসলমান রীতির খিলান এবং তার ভিতরে নিষ্কলঙ্ক পালিশ করা কাল পাথর হিন্দু রীতিতে অলঙ্কৃত। মধ্যের মিরাব্ এবং কেবলা শ্রেষ্ঠতম অলঙ্করণে শোভিত, তা'তে অপরূপ ছাঁদের আরবী অক্ষরে কোরাণের উদ্ধৃতি লিখিত রয়েছে। ধর্ম ও সৌন্দর্যের এ অপূর্ব সমন্বয় সার্থক শিল্পমানসের প্রতীক। মধ্যমিরাবের অল্পদূরেই ইমামের মর্মরখচিত রাজকীয় মিম্বার, ধাপে ধাপে উপরে উঠেছে, পরিপূর্ণ হিন্দু ছাঁদে তার ব্র্যাকেট, কার্ণিশ ও অলঙ্করণ। তিনটি সুঠাম খিলান রয়েছে

তিনদিকে, তার উপর নানা ছাঁদে রূপায়িত বন্ধনী, ছাদে ছোট সুগঠিত গম্বুজ। মিম্বার থেকে অল্পদূরে স্পর্শকাতর সুলতানকে সাধারণের স্পর্শ থেকে বাঁচাবার জন্য এবং বেগমসাহেবাদের পর্দার প্রয়োজনে প্রশস্ত দ্বিতলে রাজকীয় আসনব্যবস্থা। জাহাজ-মহল ইত্যাদি রাজপ্রাসাদ থেকে সুলতান ও তাঁর অন্তঃপুরিকারা যাতে মসজিদের ঐ রাজকীয় আসনে সোজাসুজি পেঁছিতে পারেন সেজন্য ব্যবস্থা হয়েছে সুন্দর গম্বুজ ও অলঙ্করণ শোভিত উত্তর দিকের বিশেষ দরওয়াজার। তারপর ছাদে উঠলাম—সেখানে তিনটি বিশাল প্রাথমিক মুসলমান রীতির গম্বুজ, তাকে ঘিরে রয়েছে আটান্নটি ওরই ছোট সংস্করণ। পাশের বারান্দাতেও মাথাভর্তি ছোট ছোট গম্বুজ। প্রাঙ্গণ পেরিয়ে সদর-তোরণের মাথায়, সব মাথা ছাড়িয়ে, এক পায় দাঁড়িয়ে আর একটি বড় গম্বুজ। দূরে আশরফি-মহল বা মাদ্রাসার কঙ্কাল এবং মহম্মদ শাহ খিলজীর রাণা কুম্ভজয়ের (?) প্রতীক বৃহৎ সাততলা বিজয়স্তম্ভের হৃতগর্ব, কালাহত, প্রায় তিরিশ ফুট উঁচু ধ্বংসাবশেষের প্রস্তরস্তূপ। তারপর অনন্ত আকাশ।

ইতিহাসকে বিপথগামী করবার এ এক বিচিত্র কাহিনী। যশোসূর্য উদ্ভাসিত মেবারের প্রতি পরশ্রীকাতর সুলতান মহম্মদ শাহ খিলজী এবং গুজরাটের সুলতান ষড়যন্ত্র করলেন তাকে সংযুক্তভাবে আক্রমণ করবার। মেবারাধিপ রাণা কুম্ভ তখন শতবর্ষপূর্বের আলাউদ্দিন বিধ্বস্ত মেবারকে পুনর্গঠনে ব্যস্ত। কৃষ্ণপ্রেমবিধুরা মীরাবাঈ-এর সঙ্গীত-মূর্ছনা তখন চিতোরের অন্তর বাহিরে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে—গুজরাট ও মাণ্ডুর সুলতানদ্বয়ের ষড়যন্ত্র বাস্তবে রূপায়িত হ'ল সেই মুহূর্তে (১৪৪০ খৃঃ অঃ)। জন্মভূমি রক্ষার প্রেরণায় উন্মাদ রাজপুত, রাণা কুম্ভের নেতৃত্বে এগিয়ে এল মালবের উপত্যকায়। রাণা কুম্ভের চৌদ্দ হাজার হস্তীযূথ, এক লক্ষ অশ্বারোহী ও পদাতিকের সামনে গুজরাট ও মাণ্ডুর সম্মিলিত বিশাল

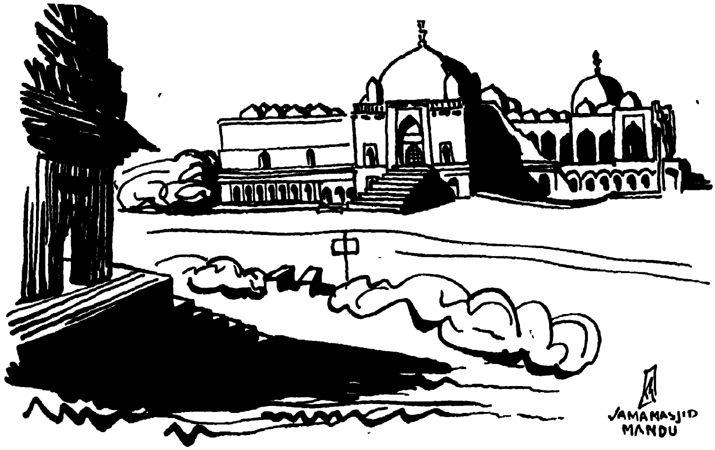
সেনাদল লজ্জাজনক পরাজয় মানতে বাধ্য হ'ল। রাণা কুম্ভ রচনা করলেন তার বিজয়স্তম্ভ। বীর রাজপুত পরাজিত সুলতান মহম্মদকে মালবের রাজমুকুটের পরিবর্তে মুক্তিদান করলেন। এ গ্লানিকর পরাজয়কে ভোলার জন্য এবং বিক্ষুব্ধ প্রজামণ্ডলকে ভোলাবার জন্য সুলতান মহম্মদ সৃজন করলেন বিজিতের এই বিজয়স্তম্ভ। খ্যাতনামা ঐতিহাসিক আবুল ফজল রাণা কুম্ভের এই বিজয়গাঁথা গৌরবোজ্জ্বল বর্ণনায় রেখে গেছেন তাঁর ইতিহাসে।

তারপর এলাম গদাশাহ্ বা ভিক্ষুকরাজের প্রাসাদে। দ্বিতীয় মহম্মদ শাহ্ খিলজীর (১৫১০—১৫২৬ খৃঃ অঃ) রাজত্বে রাজপুতপ্রধান মেদিনীরায় যে একজন বিশিষ্ট রাজসভাসদ ছিলেন তা তাঁর ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রাসাদের আকার এবং সহকর্মীদের ঈর্ষাদত্ত নামকরণ গদাশাহ বা ভিক্ষুকরাজ নামে তাঁর স্থানীয় পরিচিতির দ্বারা অনুমান করা যায়। মেদিনীরায়ের প্রভাব ও জনপ্রিয়তা স্থানীয় সুলতান দ্বিতীয় মহম্মদ শাহ খিলজীর ভীতির কারণ হয়ে উঠেছিল। সুলতান মাণ্ডু থেকে গোপনে পলায়ন করে গুজরাটের সুলতান দ্বিতীয় মজফ্ফর শাহের আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং তাঁরই সাহায্য ভিক্ষা নিয়ে কিছুদিন পরে মেদিনীরায়কে দমন করেন। অবশ্য এতে সুফল লাভ ঘটেনি, গুজরাটের পরবর্তী সুলতান বাহাদুর শাহর সঙ্গে তাঁর বনিবনা না হওয়ায় (১৫২৬ খৃঃ অঃ) বাহাদুর শাহ মাণ্ডু দুর্গ আক্রমণ করে অকর্মণ্য সুলতান মহম্মদ শাহ খিলজীকে বন্দী করেন। মাণ্ডু গুজরাটের পদানত হয়। হিন্দোলা-মহল, জাহাজ-মহল ইত্যাদি সুলতানী সৌধের কাছে মেদিনীরায়ের প্রাসাদ এবং মন্ত্রণালয় বলে পরিচিত গৃহশ্রেণীতে আছে নিজস্ব দরবারকক্ষ আর বৃহৎ খিলান ও প্রশস্ত দেওয়ালযুক্ত দ্বিতল বাসগৃহ। দোতলায় দু'টি মাঝারি এবং মধ্যে একটি বড় ঘর তা'তে সুদৃশ্য ফোয়ারার ধ্বংসাবশেষ। ফোয়ারা থেকে সুন্দর জলপ্রণালী বিচিত্র ভঙ্গীতে কক্ষসীমায় পৌঁছেছে, সেখানে হস্তীমুখ.

ব্যাঘ্রমুখ ইত্যাদি জলদ্বার দিয়ে অতিরিক্ত জল বেরিয়ে যাবার ব্যবস্থা রয়েছে। আস্তরণ করা দেওয়ালে মোজেকের কাজ এবং দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে একটি সুগঠিত মিরাব্, তা'তে অবলুপ্তপ্রায় ভিত্তি চিত্রের ধ্বংসাবশেষ, সম্ভবত রাজপুত কলমে আঁকা। বিস্মৃতির মধ্যে আবছা ধরা দেয় সাবলীল রেখায় এবং মুছে যাওয়া রঙে একটি শৌর্যবান পুরুষ ও তন্বী নারীচিত্র। রসিক ভিক্ষুক হয়ত চেয়েছিলেন পরবর্তীদের কাছে তাঁর কোন অবিনশ্বর প্রেমকে প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত করতে—মহাকাল তাঁর সে সাধে বাদ সেধেছেন। তবু ধ্বংসপ্রাপ্ত ছাদবিহীন গৃহে প্রকৃতির মুখোমুখী দাঁড়িয়ে যুগযুগ রোদ-বৃষ্টির স্নেহালিঙ্গন উপেক্ষা করে কি করে তার আজও কিছু অবশিষ্ট রয়েছে তাই ভাবছি। শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর শিল্পচর্চার কথা মনে পড়ল, ১৩৫৯ সালের চৈত্র সংখ্যা দেশ পত্রিকাতে তিনি জয়পুর ভিত্তিচিত্র সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। সংক্ষেপে তার থেকে কিছু বলছি—প্রথমে শ্বেত মর্মরের গুঁড়ো মোটা-সরু-মিহি ছেঁকে নিয়ে তিন শ্রেণীতে ভাগ করতে হবে এবং পাথুরে চুন ঠাণ্ডা জলে ফুটিয়ে ছেঁকে পরিষ্কার করে অল্প দই মিশিয়ে প্রত্যহ জল পালটিয়ে ৭।৮ দিন ভিজিয়ে রাখতে হবে, তারপর প্রথমে ঐ মর্মরের দুই ভাগ মোটা গুঁড়ো ও এক ভাগ চুন শিল-নোড়ায় ভাল করে বেটে মেশাতে হবে। এইবার দেওয়াল পরিষ্কার করে ভিজিয়ে নিয়ে ঐ মিশ্রণের প্রাথমিক প্রলেপ পুরু করে লাগাতে হবে। তারপরে এক ভাগ সরু গুঁড়ো ও এক ভাগ চুন এবং শেষে দুই ভাগ চুন ও এক ভাগ মিহি গুঁড়ো পূর্বোক্ত উপায়ে মিশিয়ে ঐ ভিজা দেওয়ালে প্রথমে মাঝারি এবং পরে পাতলা করে লাগিয়ে নিতে হবে। তারপর কয়েকদিন অপেক্ষা করে জমি শুকিয়ে এলে পর কুশের বড় কুচি দিয়ে জল ছিটিয়ে ছিটিয়ে বেলে পাথরের টুকরা সহযোগে বৃত্তাকারে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মাজতে হবে। কিছুক্ষণ মাজার পর যখন

জমি তৈরী হবে তখন খুব মিহি গুঁড়া এবং ভেজান বাসি চুনের মিশ্রণ তুলি দিয়ে জমির উপর লাগিয়ে নিয়ে আবার বেলে পাথর দিয়ে মাজতে হবে। এবার মোলায়েম ছাঁকা চুনের পাতলা প্রলেপ চার পাঁচবার লাগাতে হবে। তারপর ঐ স্যাঁতসেতে জমিতে প্রথমে কল্পিত চিত্র রেখায়িত করে অবিচ্ছেদভাবে রঙের কাজ শেষ করতে হবে। সাধারণত জয়পুর ভিত্তিচিত্রে প্রদীপের ভুসা দিয়ে কাল, ছাঁকা পাথুরে চুন দিয়ে সাদা, গেরিমাটি দিয়ে গৈরিক, এলামাটি দিয়ে হলদে, হরা পাথরের সবুজ এবং মিছরীর জল, নিমপাতার জল, ভেড়ার দুধ, লেবুর রস দ্বারা শোধিত হিংগুল দিয়ে লাল রঙ ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়েছে। সবার শেষে নারিকেলের তৈলাক্ত অংশের প্রলেপ লাগিয়ে আর একবার পালিশ লাগিয়ে কাজ শেষ করা হয়। মেদিনীরায়ের প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে শর্মাজীকে বিদায় সম্ভাষণ জানালাম। রেস্ট-হাউস অভিমুখে ধীরপদে চলতে চলতে দেখি, গোধূলির আকাশে চলেছে সাত রঙের মেলামেশা, নিভৃত-নির্জন বিন্ধ্য-প্রকৃতি নিঃসংগ আমাকে সংগদানে কৃতার্থ করল।

রেস্ট-হাউস ছেড়ে খুব ভোরে বেরিয়ে পড়লাম আঁকার সরঞ্জাম আর ভোজ্য কিছু ছাতু সংগে নিয়ে, সারাদিন কাজকর্মে কাটাবার ইচ্ছায়। বিখ্যাত কয়েকটি প্রাসাদ ও ভগ্ন দুর্গ-প্রাচীরের আশপাশ থেকে নৈসর্গ চিত্র আঁকলাম কয়েকটি। আঁকতে আঁকতে দুপুর গড়িয়ে এল, পাঁচিলের উপর এক বৃক্ষছায়ায় বসে ছাতু সহযোগে মধ্যাহ্ন ভোজন শেষ করে ঐখানেই ছোট্ট একটা ঘুম লাগালাম। ছেলেমেয়েদের হট্টগোলে ঘুম গেল ভেঙে, তাকিয়ে দেখি একদল পরিদর্শকের মধ্যে আমি শুয়ে আছি। দোপাট্টা সরিয়ে বড় বড় চোখ মেলে ছবিগুলি ও বিচিত্রবেশী আমাকে দেখছে কয়েকটি মেয়ে। পুরুষেরা এদিক ওদিক দাঁড়িয়ে রয়েছে। বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষ ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে আমার পরিচয় তলব করলেন। আলাপে



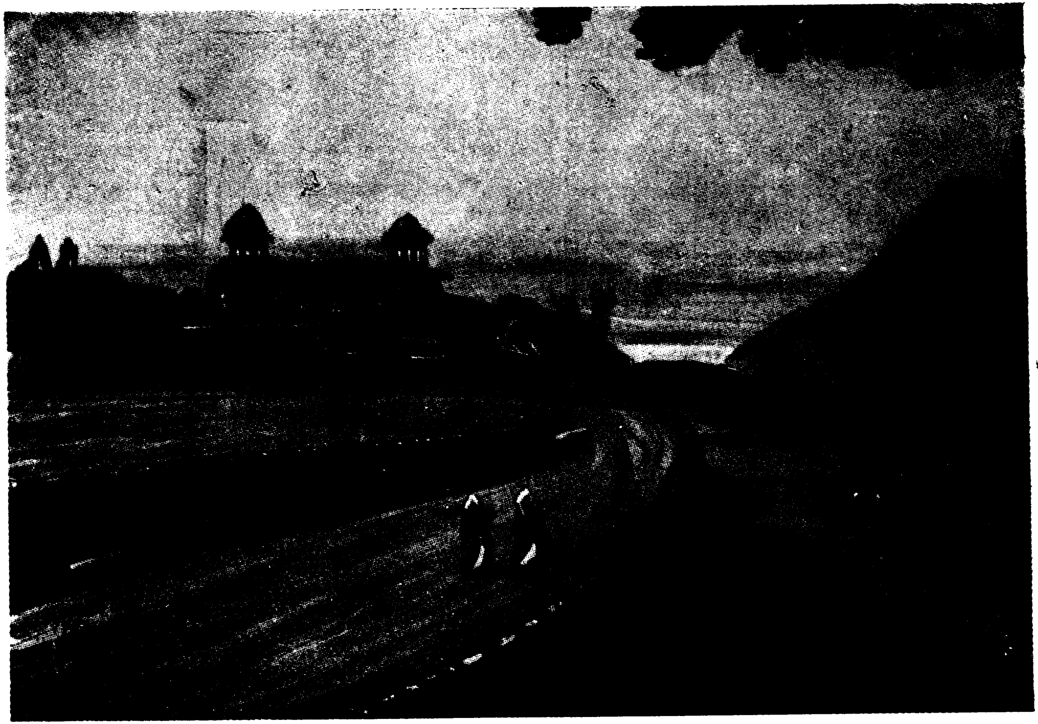


উপরে

জামা মসজিদ

নীচে

জামা মসজিদের অভ্যন্তর



রূপমতী স্মৃতিসৌধ

জানলাম এঁরা ইন্দোরের এক ব্যবসায়ী পরিবার, এখানে আজ বেড়াতে এসেছেন। ইতিমধ্যে দেখি স্থানীয় কাঠকুটো জোগাড় করে মেয়েরা ওদের দ্বিপ্রাহরিক আহার ব্যবস্থা তৈরী করে ফেলেছে, আমাকে অনুরোধ করলেন ওঁদের ভোজনসঙ্গী হবার। সবিনয়ে নিবেদন করলাম আমার অক্ষমতা, ফলে জুটে গেল এক গেলাস গরম চা। একেই বলে 'পুরুষস্য ভাগ্যম্'। মধ্য ভারতের এ পরিত্যক্ত প্রাচীন দুর্গপ্রাকারে কলকাতার আমি দিবানিদ্রা শেষ করে চা-পান অন্তে আবার ধীরে ধীরে অগ্রসর হলাম পরবর্তী দর্শনীয়ের সন্ধানে।

প্রকৃতি পট-পরিবর্তন করলেন, রুক্ষতা ক্রমে শ্যামলিমায় এসে মিলেছে। বিস্মিত মনে কারণ চিন্তা করতে করতে কাঁচা পথ ধরে দক্ষিণ দিকে এগিয়ে চলেছি। সাগরতালাও নামে বিশাল হ্রদের পাশ দিয়ে পথ এগিয়ে গেছে সামনে। পথপার্শ্বের মাটি ধীরে ধীরে ঢালু হয়ে, গুচ্ছ গুচ্ছ জোলো ঘাস ও আগাছার মালা পেরিয়ে হ্রদের জলে গিয়ে মিশেছে, চারিপাশে তার বনরাজি আর কাঁচা সবুজের গালচে পাতা, শস্যপূর্ণ মাঠ, সীমান্তের পর্বতশ্রেণী ঘনবনানীশোভিত। বহুদিন পরে ভেজা মাটির গন্ধ শ্রান্ত মনকে সঞ্জীবিত করল। পথ ক্রমে এঁকে বেঁকে পশ্চিমদিকে মোড় ফিরে দুর্গপ্রান্তে উপস্থিত হয়েছে, সেখানে ধাপে ধাপে একষট্টিটি সিঁড়ি নেমে একটি প্রশস্ত প্রাঙ্গণে এসে পৌঁছলাম। নির্দেশনামায় বুঝলাম নীলকণ্ঠ শিবের মন্দির। এ বড় বিচিত্র জায়গা, নীলকণ্ঠ মন্দিরকে কেন্দ্র করে দু'পাশে দুই পর্বতবাহু উত্তরে আর পশ্চিমে এগিয়ে গেছে সীমান্ত সন্ধানে। খাড়া পাহাড় প্রায় হাজার ফুট নীচে নেমে গেছে, সেখানে অন্ধকার উপত্যকা। আশপাশের শীতের কুহেলিকা পাহাড়কে জড়িয়ে জড়িয়ে সোহাগরত, অপরাহ্নের সূর্যরশ্মি ক্ষণে ক্ষণে তার রঙ পরিবর্তন করছে, প্রকৃতি এখানে অকৃপণ প্রসাধনে অনিন্দ্যসুন্দরী।

সুদৃশ্য মোঘল স্থাপত্যে রূপায়িত এ হিন্দু শিবমন্দির দেবতার

মৃত্যুঞ্জয় নাম সার্থক করেছে। প্রাচীন হিন্দু রাজারা মাণ্ডু দুর্গের সুন্দরতম স্থানে মহাকালের নিত্যপূজার আয়োজন করে কালজয়ী হবার চেষ্টা করেছিলেন। মধ্যযুগে বিলাসী মোঘল সে স্থান দেবতার কাছ থেকে বাজেয়াপ্ত করে রচনা করেন তার প্রমোদভবন, তারপর কালকবলিত মোঘল সাম্রাজ্যের এ অংশ ছিনিয়ে নিয়েছিল মারাঠা। মাণ্ডু দুর্গের শেষ মোঘল দিয়া-বাহাদুরকে ধারা নিকটস্থ তিরলার যুদ্ধে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করে মারাঠা বীর মলহার রাও হোলকার (১৭৩২ খৃঃ অঃ) মাণ্ডু অধিকার করেন এবং তখন থেকে এই কয়েকদিন আগে পর্যন্ত ধারা রাজের অধিকারে ছিল মাণ্ডু। ধারার মারাঠা রাজারাই আবার এখানে প্রবর্তন করেন নীলকণ্ঠের নিত্যপূজা। মৃত্যুকে বার বার জয় করেন মৃত্যুঞ্জয়। মোঘল স্থাপত্য ও ফারসি লিপিপূর্ণ প্রস্তরফলকখচিত বিলাসভবনের এ আবহাওয়া হিন্দু মন্দিরসুলভ গাম্ভীর্যকে যতটা হাল্কা করে দিয়েছে, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য পুষিয়ে দিয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশী। দক্ষিণদিকে অর্থাৎ মধ্যে দেবগৃহ এবং উপরে আচ্ছাদিত চাতাল, তার সামনে পূর্ণ জলাধার, মধ্য দিয়ে পথ তিন চার ফুট নীচে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে নেমে গেছে। প্রাঙ্গণসীমান্তে খাড়া পর্বত তলিয়ে গেছে অতলে। দুর্গের উপর থেকে ক্ষীণ জলধারা সুগঠিত পথ ধরে সোজা নেমে এসেছে দেবগৃহ পর্যন্ত; সেখানে অষ্টপ্রহর ঝির ঝির ধারায় শিবলিঙ্গ প্লাবিত করে এসে পড়ছে সামনের জলাধারে, পূর্ণ জলাধার উপচে পড়ছে প্রাঙ্গণে। সেখানে জলপ্রণালী গড়িয়ে প্রবাহিত হয়ে গেছে সীমান্তের অন্ধকারে। তারপর নীচের উপত্য- চিক্ চিক্ করছে জলরেখা। দুই পার্বত্য বাহুর সমান্তরালে আছে কয়েকটি শ্রেণীবদ্ধ কক্ষ। উপস্থিত সেখানে বিলাসীর বদলে পূজারীর অবস্থান। প্রস্তরখচিত ফারসী লিপিমালা বহন করে চলেছে বীর্যবানের ইতিহাস, দরদীর কবিতা। কোনটিতে লেখা সম্রাট আকবরের খান্দেশ ও দাক্ষিণাত্য বিজয়ের সন্দেশ, আবার কোথাও অদৃষ্টবাদীর রোবাইয়াৎ।

ওরই মধ্যে লিপিবদ্ধ রয়েছে স্থানীয় মোঘলপ্রধান, এ প্রাসাদ নির্মাতা শাহ বুদাগ খাঁ এর রসিকজনের প্রতি নিবেদন—

তঁবা কর্দন তমামে উমরা মসরুফ আবোগিল
কে শায়দ এক দঁমে সাহব হামে ইঞ্জা কুনদ্‌মঞ্জিল।

অর্থাৎ জীবন সাধনায় অর্জিত পার্থিব এ সুখ-সম্পদ হয়ত গুণীজনের মুহূর্ত বিশ্রামকে মনোরম করতে পারবে।

নীলকণ্ঠ মন্দির থেকে উঠে দক্ষিণ দিকে এগোতে লাগলাম আমার পরবর্তী গন্তব্যস্থান তারাপুর-দরওয়াজা অভিমুখে। তারাপুর মাণ্ডুর সবচেয়ে বেশী ঘটনাবহুল ঐতিহাসিক তোরণ। হাজার ফুট নীচে নিমর উপত্যকার সমকোণে পর্বত সোজা উঠে এসেছে প্রাচীর পর্যন্ত। এ ঋজুতা কোন পার্থিব প্রাণীর পক্ষে লঙ্ঘন করা অসম্ভব, মানববুদ্ধিগোচর সবরকম সম্ভাব্য রক্ষণ ব্যবস্থা ও প্রাকৃতিক সুবিধার দ্বারা সুরক্ষিত এ দুর্গের সবচেয়ে নিরাপদ পার্শ্ব হল দক্ষিণ-পশ্চিম দিক এবং তারাপুর-দরওয়াজা। তবু ইতিহাসের সাক্ষ্য রয়েছে এদিক দিয়েই বার বার দুর্গ আক্রান্ত হয়ে পরাভূতও হয়েছে কয়েকবার। প্রাথমিক মুসলমান [illegible]পত্যরীতির গঠনপ্রণালী ও খিলান দ্বারা প্রস্তুত এ দরওয়াজার প্রস্তর[illegible]ত লিপি পাঠে জানা যায়, মাণ্ডুর প্রথম সুলতান দিলওয়ার খাঁ ঘোরী [illegible] নি[illegible] (১৪০৪-৫ খৃঃ অঃ)। গম্বুজশোভিত ছাদ, নীচ দিয়ে [illegible]বাঁকা পথ তোরণ পেরিয়ে সম্মুখস্থ চাতালে পেঁচেছে। সেখান থেকে [illegible] গেছে পা[illegible] বাঁধান খাড়া রাস্তা ও হাজার সিঁড়ির হাঁটা পথ নীচের [illegible]র্যন্ত। তারাপু[illegible]দরওয়াজার ভিতরের দ্বিতীয় তোরণ ও আশপা[illegible]র্ধন ও পরিবর্তন সাধিত হয়েছে সম্রাট আকবরের আদেশে। সে সম[illegible] এক [illegible] লিপি এ সংবাদের বাহক।

বাইরের চাতালে দাঁড়ি[illegible] পারিপার্শ্বিকতার বিচারে ইতিহাসকে উপলব্ধি করবার চেষ্টা করছিলাম। [illegible] কখন কখন কল্পনাকে ছাপিয়ে

যায়। মাণ্ডু তখন গুজরাটী সুলতানের অধীন। সুলতান বাহাদুর শাহ স্বস্থান ছেড়ে মাণ্ডুতেই অবস্থান করছেন। মোঘল হুমায়ুন আক্রমণ করলেন এ দুর্গ। খুঁটিয়ে বিচার করে রণকৌশলী হুমায়ুন বুঝতে পারলেন সবদিক থেকেই সুরক্ষিত এ দুর্গ এবং সম্মুখ সমরে সুফল লাভ সুদূরপরাহত—তখন সবচেয়ে দুরাধিগম্য নিমর উপত্যকার এই তারাপুর দরওয়াজাতেই তাঁর লক্ষ্য স্থির করে দুর্গ অবরোধ করে সুযোগের অপেক্ষায় রইলেন। দুর্গম বলেই সম্ভবত এদিকের রক্ষণ ব্যবস্থায় শিথিলতা ছিল। তাই চতুর হুমায়ুনের চকিত আক্রমণে পরাভূত হল মানুষ ও প্রকৃতির যুগ্ম রক্ষাব্যবস্থা। মাণ্ডু হুমায়ুনের পদানত হল। দক্ষিণঘেঁষা পশ্চিম সীমান্তের বিচ্ছিন্ন এক খাড়া পর্বতে সংকীর্ণ পথযোজক দ্বারা সংযুক্ত শোনগড় দুর্গ ও দরওয়াজা, যা প্রাকৃতিক ও মানুষের রক্ষণব্যবস্থায় অজেয়। সেখানে এসে আশ্রয় নিলেন সুলতান বাহাদুর শাহ। কিম্বদন্তী শোনা যায়, শোনগড় তোরণে তখন সসৈন্যে হুমায়ুন উপস্থিত। সুলতান নিজের ভীত, রণক্লান্ত, নিরস্ত্র, ক্ষীণ সেনাবাহিনীর পক্ষে বেশীক্ষণ দুর্গরক্ষা অসম্ভব বুঝে বিশ্বস্ত এক দেহরক্ষীকে সুলতানী-পোষাকে রাজকীয় অশ্বে সোয়ারী হয়ে হাজা [illegible] ফুট নীচের নিমর উপত্যকায় সোজা লাফিয়ে পড়তে আদেশ [illegible] অজেয় শোনগড়-দরওয়াজার বাইরে অপেক্ষমান সসৈন্য হু [illegible] উপর সুলতানী সৈনিক সে আদেশ পালন করল [illegible] নীচের প্রস্তরসংকুল উপত্যকায় একফোঁটা [illegible] ঘটনা দেখে হয়ত হুমায়ুন বিশ্বাস করে [illegible] এ সুযোগের অপব্যবহার সুলতা [illegible]

যখন শোনগড়ে [illegible] ায়। সংকীর্ণ এ তোরণমুখী গিরি [illegible] নয়, তা ছাড়া অন্ধকার ঘনি [illegible] আঁচড়ে দ্রুত ছকে নিলাম

[illegible]ম্মুখ সমরে অজেয় শোনগড়-দরওয়াজাকে। তারপর অন্ধকারে পথ [illegible]তড়াতে হাতড়াতে তিন চার মাইল পিছনে ফেলে আসা রেস্টহাউসের [illegible]দকে ফিরে চললাম। ক্ষীণ বিজলী বাতি ক্ষণে ক্ষণে মৃত্যুসীমা চিনিয়ে [illegible]দিচ্ছে, যদি হঠাৎ বাতির মশলা ফুরিয়ে যায় তো এখানেই রাত্রিবাস অথবা [illegible]জার ফুট নীচের গভীর অন্ধকারে বীর সুলতানী সৈনিকের অনুসরণ। [illegible]ধ্যে আর কোন পথ নেই। গুরুদেব ভোলা চট্টোপাধ্যায়ের অভিজ্ঞ উপদেশ বাস্তবে উপলব্ধি করলাম, সত্যিই অজানা বিদেশে নিশীথভ্রমণ পরিত্যজ্য। তবু মন আনন্দে পরিপূর্ণ, কারণ মধ্যযুগের ভারতীয় শৌর্যবীর্যের স্মৃতিসৌধ শোনগড় দরওয়াজার চিত্রায়ণ প্রাক্তন সৈনিক হিসাবে আমার কর্তব্য, পূর্বসূরীদের প্রতি এ আমার শ্রদ্ধানিবেদন।

আজকে আমার চলার পথ মাণ্ডুর প্রেমতীর্থ বাজবাহাদুর ও রূপমতীর স্মৃতিবিজড়িত প্রাসাদ ও বিহারসৌধে। মধ্যভারতের জনমানসে এ প্রেমিকযুগল চিত্র ও সঙ্গীতে চিরন্তনরূপে জীবন্ত। ধর্মের ছুতমার্গ এ মহিমান্বিত প্রেমের কাছে আপন ক্ষুদ্রতায় অচ্ছুত। কলকাতার নানা চিত্রসংগ্রহে ও চিত্রপুস্তকে বাজবাহাদুর ও রূপমতীর যুগল চিত্র [illegible]র্শনের সৌভাগ্য আমার ঘটেছে, তবে সেগুলি প্রধানত রাজপুত অথবা [illegible]র্গ-চিত্রশৈলীর, অর্থাৎ শিল্পশাস্ত্রানুযায়ী অঙ্কিত চিত্র। এখানে [illegible] লোকশিল্পী ও মার্গ-চিত্রশিল্পীরা তাঁদের অবিনশ্বর [illegible]কে চিত্রায়িত করেছেন যুগে যুগে, বারে বারে। [illegible] চিত্রশৈলী অবলম্বনে মধ্যভারতের চিত্রধারা [illegible]ুঁজতে গেলে জের টানতে হয় বৈদিক, বৌদ্ধ ও হি[illegible]

১৯২২ [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় সিন্ধু উপত্যকায় প্রাগৈতিহা[illegible] ব্যর করেন। সেখানে পোড়ামাটির কাজ, [illegible] সম্ভবত

ভারতের প্রাচীনতম চিত্র ও ভাস্কর্যকর্মের চাক্ষুষ প্রমাণ পাওয়া সম্ভব হয়েছে।

তারপর সেই সভ্যতারই বিভিন্নধারা কাথিয়াবাড়ের আশেপাশের লোথাল রংপুর ইত্যাদি জায়গা থেকে আবিষ্কার করেছেন বর্তমান ভারতের প্রত্নতত্ত্ববিভাগ। এই আবিষ্কার সম্ভবত প্রমাণ করতে সক্ষম হবে প্রাগৈতিহাসিক ভারতীয় সভ্যতার সঙ্গে আদি-আর্য ও প্রাক্-বৌদ্ধ সভ্যতার অবিচ্ছিন্ন যোগাযোগ; কিন্তু এখনও পর্যন্ত প্রাক্-বৌদ্ধযুগের ভারতীয় চিত্রকর্মের প্রমাণ আমাদের কাছে কিছু প্রকাশিত নয়। তাই এর অস্তিত্ব প্রমাণ করতে গেলে সাহায্য নিতে হবে বৈদিক সাহিত্য ও পৌরাণিক মহাকাব্যগুলি থেকে।

ঋক্‌বেদের ঋষি উষাকে রূপায়িত করতে যে চিত্রকল্পের সাহায্য নিয়েছেন তা ভাষাগত হলেও চিত্রকরসুলভ শিল্পমানসের প্রতীক বলে ধরা যেতে পারে। তাছাড়া বিশ্বকর্মা কল্পনাও বৈদিক। তৈত্তিরীয় সংহিতাতে রথকার, তক্ষ অর্থাৎ ছুতোর, কুলাল অর্থাৎ কুমোর, কর্মার অর্থাৎ কামার ইত্যাদির কথা আছে ঃ

"নমস্তক্ষভ্যো রথকারেভ্যশ্চ বো নমো নমঃ
কুলালেভ্যঃ কর্মারেভ্যশ্চ বো নমঃ।"

এরা চিত্রকর না হলেও কারুশিল্পী। যদিও বৈদিকযুগে দেবমূর্তির অস্তিত্ব সম্পর্কে মতদ্বৈধ আছে, তবুও আচার্য শঙ্কর তাঁর সূত্রভাষ্যে বৈদিক ঈশ্বরের স্বর্ণমূর্তি (হিরণ্যমানশ্রু) [illegible] উল্লেখ করেছেন। মাননীয় বি, সি, ভট্টাচার্য মহাশয় তাঁর 'ইণ্ডিয়ান ইমেজেস' বইতে এবিষয়ে বিভিন্ন প্রমাণ উপস্থিত করেছেন। মাননীয় হীরানন্দ শাস্ত্রী মহাশয়ও মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত তৃতীয় ওরিয়েন্টাল কনফারেন্সে তাঁর 'ইমেজ ওয়ারশিপ ইন ইণ্ডিয়া' শীর্ষক বক্তৃতায় প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন বৈদিকযুগে হিন্দু-মূর্তির অস্তিত্ব এবং [illegible] বিনিময়ে তার আদান-প্রদান সম্পর্কে।

বৈদিকযুগে যজ্ঞশালায় দেবতাদের পক্ষে নিমন্ত্রণ রক্ষা সম্ভব হতো সম্ভবত তাঁদের মূর্তির সাহায্যে। সামবিধান ব্রাহ্মণে পাওয়া যায় হাতি, ঘোড়া, রথ, পদাতিক ইত্যাদি মূর্তির কথা। কিন্তু চিত্রশিল্প কথাটি বর্তমান অর্থে সম্ভবত সে যুগে প্রচলিত ছিল না। তবে সায়ণ ভাষ্যে 'শিল্পো বহুরূপঃ' বলে আখ্যাত হয়েছে। কৌষীতকী ব্রাহ্মণে শিল্পের অর্থ করা হয়েছে নৃত্য, সঙ্গীত ইত্যাদি; শতপথ ব্রাহ্মণে সম্ভবত শিল্পকে ভাস্কর্য ও চিত্রকর্মরূপে অর্থ করা হয়েছে। সংস্কৃত সাহিত্যে বহু ব্যবহৃত শব্দ প্রতিরূপের অর্থ চিত্রকর্ম বা ভাস্কর্য এবং সম্ভবত শতপথ ব্রাহ্মণে প্রতিরূপ শব্দটি ব্যবহারের উদ্দেশ্যও তাই।

তারপর পৌরাণিক মহাকাব্যগুলিতে দেখি কৃষ্ণপৌত্র অনিরুদ্ধ ও উষার প্রেমকাহিনীতে প্রেমবিহ্বলা উষা তাঁর স্বপ্নে দেখা রাজপুত্রকে চিত্রায়িত করতে অনুরোধ করছেন সখী চিত্রলেখাকে। রামায়ণে লঙ্কার রূপবর্ণনা করতে গিয়ে কবি রাবণের চিত্র-শালাগৃহের উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া বেদোক্ত শিল্পদেবতা বিশ্বকর্মা ও দানবকুলোদ্ভব কৃতিশিল্পী ময় সম্বন্ধে আলোচনা রামায়ণে আছে। মহাভারতের কবি দেবালয়, যজ্ঞশালা, রাজগৃহ ইত্যাদির শিল্পসৌন্দর্যের মনোরম বিবরণ রেখে গেছেন তাঁর মহাকাব্যে। সম্ভবত এগুলি বৈদিক শিল্পেরই পরম্পরা।

সপ্তদশ শতাব্দীর তিব্বতীয় ঐতিহাসিক লামা তারানাথের মতে মহাপরিনির্বাণের (খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতকে) বহু পূর্বে দেবশিল্পশৈলী মগধে অব্যাহত ছিল। অপরূপ সে প্রাচীন রূপকল্পের স্রষ্টা ছিলেন দেবশিল্পীগণ। পরবর্তী যুগে সে ধারার বাহক হলেন পুণ্যযান বা যক্ষশিল্পীরা এবং তারপর সে ধারা বহন করে চলেন নাগশিল্পীকুল। কুমারস্বামী বলেছেন, বৌদ্ধ প্রভাববর্জিত ভারতীয় শিল্পের হদিস পাওয়া যায় অশোকের সমসাময়িক ও তাঁর নিকট-পরবর্তী যুগে। সে শিল্পের প্রধান প্রাণবস্তু ছিল প্রকৃতি ও আদিম দেবদেবী; যথা পৃথ্বী, বরুণ, মকর, নাগ, যক্ষ

ইত্যাদি। সে শিল্পের চাক্ষুষ প্রমাণ রয়েছে বেশনগর, পরখাম, সাঁচী, ভারহুত ইত্যাদি প্রাথমিক বৌদ্ধ ভাস্কর্যশিল্পে।

যে বৌদ্ধ সংস্কৃতি সে-যুগে সমগ্র পূর্ব-এশিয়া প্লাবিত করেছিল তার উৎস ভারতবর্ষেরই শিল্প-সাধনা সে কথা আজ সর্বজন স্বীকৃত। বুদ্ধবাণী ও ধর্মমতকে জনমনগোচর করার প্রথম প্রচেষ্টা হয়েছিল সম্ভবত কাব্য, নাটক ও সঙ্গীতের মাধ্যমে। সৌন্দর্য আমার কাছে গুণহীন—একথা রয়েছে দশধম্মসুত্তে। অতএব ধারণা করা যায়, চিত্র ও ভাস্কর্যের দর্শনেন্দ্রিয়জাত প্রত্যক্ষ আবেদনের শক্তি বৌদ্ধসঙ্ঘপতিদের তখনও অজ্ঞাত ছিল। 'বিশুদ্ধি মগ্‌গো'-তে বলা হয়েছে আকার এবং আনুষঙ্গিক দ্বারা চেতনাপ্রসূত যে প্রেম এবং ভক্তি তা বিলাসব্যসনতুল্য, সুতরাং পরিত্যাজ্য। চিত্রকর সঙ্গীতকার, সুগন্ধিকার, সূপকার প্রভৃতিকে বিলাসব্যসনের পরিবেশক হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে সে যুগে। তাই আকারগত সৌন্দর্যের বাহক বলে বৌদ্ধসঙ্ঘে নরনারীর অবয়ব চিত্রিত করা নিষিদ্ধ ছিল। ফলে সেকালের চিত্রকর্ম লতাপুষ্প ইত্যাদি রূপায়নে সীমাবদ্ধ থাকতো। প্রাচীন হীনযানী এ রীতির সঙ্গে সমসাময়িক জৈন ও কিছু ব্রাহ্মণ্য রীতির নীতিগত মিল ছিল স্পষ্ট।

প্রচলিত হিন্দু চিত্রধারার প্রতিভূ হিসাবে গড়ে উঠেছিল প্রাথমিক বৌদ্ধ শিল্পকর্ম এবং বৌদ্ধধর্মের বিশেষ বিশেষ নিজস্ব প্রয়োজন ক্রমে তাকে রূপ দিয়েছিল বৌদ্ধ শিল্পধারায়। অবশ্য এর ব্যতিক্রম দেখা যায় অশোকস্তম্ভ ও স্তম্ভশীর্ষ রূপায়ণে। তার অনুপ্রেরণা সম্ভবত ভারতবর্ষের বাইরে থেকে এসেছিল এবং তা ছিল বেশ কিছুটা বৌদ্ধ রীতিবহির্ভূত। তারপর খৃঃ পূঃ দ্বিতীয়-তৃতীয় শতকে বৌদ্ধ-শিল্প যে রূপ পরিগ্রহ করলো সাঁচী, ভারহুত, বুদ্ধগয়া ইত্যাদির শিল্পীরা তাঁদের শিল্পকর্মে তার প্রমাণ রেখে গেছেন যক্ষ-যক্ষিণী এবং জাতক চিত্রায়ণের মধ্যে। তখনও হীনযান ধর্মানুশাসনে বুদ্ধমূর্তি রূপায়ণ

নিষিদ্ধ ছিল। ধর্মানুশাসনকে মেনে নিয়ে বুদ্ধের উপস্থিতি নির্দেশ করলেন শিল্পী তাঁর তীক্ষ্ণধীপ্রসূত প্রতীকের সাহায্যে। মহাপরিনিষ্ক্রমণ রূপায়িত করতে গিয়ে শিল্পী রচনা করলেন অশ্ব কণ্টক এবং তার সাথী ছন্দককে। আশেপাশের দেবকুল তাদের অনুসরণ করছেন, কিন্তু কণ্টকের পৃষ্ঠে আরোহীর অভাব। কারণ সিদ্ধার্থের অবয়ব অঙ্কন তখনও শাস্ত্রে নিষিদ্ধ। মহান্ এ-বিশেষ যাত্রাকে শিল্পী পবিত্রতা আরোপ করলেন প্রতীকের সাহায্যে। অর্থাৎ গমনোদ্যত এই পবিত্র অশ্বপদসমূহ ভূমিস্পর্শ থেকে বাঁচিয়ে সাগ্রহে ধারণ করেছেন দেবগণ। এই ধরণের প্রতীক ব্যবহারে শিল্পীরা তথাগতকে বহুবারই উপস্থিত করতে সক্ষম হয়েছেন তাঁদের চিত্রকর্মে। কখনও পদ্ম, কখনও হস্তি, শ্রীপদ, জ্যোতিচ্ছটা, বোধিবৃক্ষ ইত্যাদি নানা প্রতীক বুদ্ধের পরিবর্তে তাঁরা বহু স্থানে বিভিন্ন রূপে ব্যবহার করেছেন।

এই প্রতীকধর্মী হীনযান শিল্পরীতি ক্রমশ মহাযানদের বুদ্ধমূর্তিতে পরিণত হওয়ার ইতিহাস অজন্তা ভাস্কর্য ও ভিত্তিচিত্রে সুস্পষ্ট। খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতক থেকে দ্বিতীয় খৃষ্টাব্দের মধ্যে তৈরী চৈত্য ও বিহারগুলিতে হীনযান যুগের অনাড়ম্বর চিত্রন ও ভাস্কর্য ধারা এবং প্রাচীন কাষ্ঠনির্মিত স্থাপত্য প্রণালীর অনুসরণ দেখা যায়। পরে মহাযান মতের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে আড়ম্বরপূর্ণ ভাস্কর্য ও চিত্রধারায় হীনযানী অনাড়ম্বর দারু স্থাপত্য রীতিবর্জিত হয়েছে।

যুগ পরিবর্তন ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্ঘপতিরা মেনে নিয়েছিলেন চিত্রকর্মের দর্শনজাত প্রত্যক্ষ আবেদন শক্তিকে। লামা তারানাথ বলেছেন, বৌদ্ধধর্ম প্রসার যেখানে সম্ভব হয়েছে সেখানেই উপস্থিত হয়েছেন তার সহগামী দক্ষ সঙ্ঘ-শিল্পী গোষ্ঠী। পূর্ব-এশিয়ার বিভিন্ন দেশজ জ্ঞানান্বেষী মানুষ সদ্ধর্মচ্ছায়া ও উপদেশের আকাঙ্ক্ষায় যখন ভারতবর্ষের সঙ্ঘগুরুদের অনুরোধ করতেন, জ্ঞানী ভিক্ষু প্রেরণের জন্য

তখন সে ডাকে সাড়া দিয়ে যে-জ্ঞানী শুরু করতেন এ কষ্টকর সুদূর যাত্রা স্বভাবতই তাঁকে বাধ্য হ'তে হ'তো ভ্রমণকে সুখকর করবার জন্য গুরুভার ওজনের সীমাবদ্ধতা রক্ষা করা। ফলে বেশী পুঁথিপত্রের বদলে সঙ্গে নিতেন জড়ানো বা দীঘল পট। সম্ভবত সেই দীঘল পটের আজকের প্রতিভূ হলো তিব্বতী ও নেপালী টঙ্কচিত্র।

ইতিহাসে দেখা যায়, বহু ধর্মমত ও পথ তার ভক্তবৃন্দের সাংস্কৃতিক জীবন ও কর্মকে যথেষ্ট প্রভাবান্বিত করেছিল। কিন্তু বৌদ্ধ সংস্কৃতির যে প্রচণ্ড শক্তি সমস্ত পূর্বদেশ, যথা সিংহল, যবদ্বীপ, শ্যাম, ব্রহ্মদেশ, নেপাল, তিব্বত, বামিয়ান, খোটান, দান্দানউইলিক, বাজাকলিক, কিজিল, তুরফান, তুংহুয়ান, চীন, জাপান ইত্যাদিতে জ্ঞানমার্গ ও নৈতিকজীবন, বিশেষ করে তার শিল্পধারাকে যে যথেষ্ট প্রভাবান্বিত করেছিল তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ ঐসব দেশের শিল্পকর্মের মধ্যেই ছড়িয়ে রয়েছে। আজ হয়তো ওসব দেশের অনেক যায়গায়ই বৌদ্ধধর্মের প্রচলন নেই, তবুও তার শিল্পজীবনে বৌদ্ধ সংস্কৃতি যে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে চক্ষুষ্মান দর্শককে তা খুঁজে বার করতে কষ্ট পেতে হবে না।

লামা তারানাথের মতে এইসব শিল্পরীতির প্রায় আটশ' বছর ধরে উত্থান পতনের প্রচলিত ইতিহাস খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তারিত। তারপর ঐ শিল্পধারা কিছুদিন অন্ধকারের মধ্যে আবদ্ধ থেকে আবার পুনর্জীবন লাভ করল ভারতের তিন অংশে তিন রূপে। পশ্চিম দেশে অর্থাৎ রাজপুতানায়, মধ্যদেশে অর্থাৎ উত্তর প্রদেশে এবং পূর্বদেশে অর্থাৎ বরেন্দ্রভূমে বা বাংলাদেশে। মগধের রাজা বুদ্ধপক্ষের সময় সম্ভবত খৃষ্টীয় পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে মহাশিল্পী বিম্বসার প্রাচীন দেব-শিল্পশৈলীতে নবপ্রাণ সঞ্চার করে সৃষ্টি করলেন মধ্যদেশীয় শিল্পরীতি। খৃষ্টীয় সপ্তম শতকে উদয়পুররাজ শিলাদিত্য গুহিলার সময় প্রাচীন যক্ষশিল্পধারার প্রেরণায় পশ্চিম দেশীয়

শিল্পশৈলীর সৃষ্টি করলেন মহৎ শিল্পী শৃঙ্গধর। সম্ভবত তখন থেকেই রাজপুত চিত্রশৈলীর প্রথম পদসঞ্চার শুরু হল। তারপর বাংলাদেশে রাজা ধর্মপাল ও দেবপালের সময় খৃষ্টীয় নবম শতকে নাগ শিল্প নবরূপে পুনর্জীবিত হল এবং তার স্রষ্টা শিল্পাচার্য ধীমান ও বিতপাল। আধুনিক গবেষকদের মতে অজন্তা-বাঘ ও দাক্ষিণাত্যের সিত্তানাবাশীল-বাদামী গুহার ভিত্তিচিত্রের সাথে সাথে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে বৌদ্ধ, হিন্দু ও জৈন চিত্রধারার ঠিকানা হারিয়ে যায়। তারপর ভারতীয় চিত্র পরম্পরার হদিস খুঁজে পাওয়া যায় ইলোরার রঙমহলে, মধ্য-এশিয়ায়, তিব্বতে, নেপালে। মধ্য-এশিয়ার খোটান গুহাশ্রেণী, দান্দানউইলিক ইত্যাদি অষ্টম শতাব্দীর গুহা-ভিত্তিচিত্রের সঙ্গে অজন্তা বাঘের ব্যবহৃত চিত্ররীতির ঘনিষ্ঠতা দেখে অনুমান করা সম্ভব এর ভারতীয় পরম্পরা। বৌদ্ধধর্মের পতন ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের উত্থানের সময় ধর্ম ও রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার মধ্যেও শিল্পীর সাধনা যে নিরবচ্ছিন্ন ছিল তারও প্রমাণ পাওয়া গেছে। অষ্টম শতাব্দীর প্রথম বর্ষে যখন আরব দিগ্‌বিজয়ী মহম্মদ কাশেম সিন্ধুদেশ আক্রমণ করেন তখন কয়েকজন হিন্দু শিল্পী কর্মপ্রার্থীরূপে তাঁর দরবারে হাজির হয়েছিলেন; এ সংবাদ দিয়ে গেছেন কাশেম সহগামী একজন ঐতিহাসিক। নবম-শতকের গুর্জর প্রতিহার রাজপুত অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে আবার ভারতীয় শিল্পধারা প্রবাহমান হল, এ সময় হিন্দু চিত্ররীতি কিছুটা অবদমিত হলেও ভাস্কর্য ও স্থাপত্যশৈলীর বিশেষ বিকাশ লাভ ঘটে। নির্বাণোন্মুখ দীপশিখার মত চিত্র, ভাস্কর্য ও স্থাপত্যরীতি আর একবার পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে চরম বিকাশ লাভ করল। মালবে পরমার-রাজপুত প্রাধান্য লাভ করল। রচিত হল সমরাঙ্গন-সূত্রধার ইত্যাদি নানা আর্য ও দ্রাবিড় শিল্পশাস্ত্র। সমসাময়িক চিত্র ও ভাস্কর্যের নিরিখ খুঁজে পাওয়া যায় পরমার রচিত ইলোরার ভিত্তিচিত্রে, নেমাবরে ভোজনির্মিত সিদ্ধনাথ

মন্দিরে চান্দেল্য-রাজধানী জুঝোটি বা আধুনিক বুন্দেলখণ্ডের খর্জুরবাহক বা খাজুরাহের মন্দিরশ্রেণীতে (৯৫০-১০৫০ খৃঃ অঃ)। ইতিহাস প্রসিদ্ধ আরব পরিব্রাজক ইবনবতুতা এখানে এসেছিলেন ১৩৩৫ খৃষ্টাব্দে এবং খর্জুরবাহকের রূপে বিমোহিত হয়ে দেশে ফিরে যান। সেখানে শ্রোতারা বতুতার খাজুরাহের রূপবর্ণনা শুনে তাঁকে মিথ্যাবাদী বলে উপহাস করেন। সমকালীন এই শিল্প পরম্পরাতেই অনুপ্রাণিত হয়েছে আবুপাহাড়ের বিমলা, তেজপাল ইত্যাদি জৈন মন্দিরশ্রেণী (১০৫২—১২৩২ খৃঃ অঃ), কাথিয়াবাড়ের কুমারপালকৃত সোমনাথ মন্দির (১১৪৩—৭৪ খৃঃ অঃ), দক্ষিণ ভারতে তাঞ্জোরের বৃহদীশ্বর মন্দির (১০০০ খৃঃ অঃ), মহীশূরে হয়শাল রাজধানী হালেবিড় ও বেলুড়ের সুন্দর-কেশব মন্দির (১১১৭ খৃঃ অঃ) প্রভৃতি। খ্যাতিমান ইরাণী দেশ-দর্শক আবদুল রেজাক ১৪৩৩ খৃষ্টাব্দে সুন্দর-কেশব মন্দির দেখে স্তম্ভিত হয়ে বলেন 'বিচিত্র এ মন্দিরের রূপবর্ণনা করতে আমার সাহস নেই, কারণ শ্রোতা তাকে অতিরঞ্জিত বলে ধারণা করবে'। এই শিল্প পরম্পরাই উড়িষ্যার শিল্পরীতির প্রাণশক্তি। ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ (১০০০ খৃঃ অঃ), ইত্যাদি মন্দিরে, কোনার্কে (১২৫০ খৃঃ অঃ) ঐ রীতিরই রূপায়ন হয়েছে বারে বারে। বাংলা দেশের চিত্রে, স্থাপত্যে এবং ভাস্কর্যে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় শিল্প পরম্পরা খুঁজে পাওয়া যায়, দেখতে পাওয়া যায় পালযুগের বৌদ্ধ পুঁথিতে, নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রমণ চিত্রিত টঙ্কচিত্রে, যার বর্ণনা করেছেন একাদশ শতাব্দীর চৈনিক সমালোচক তেং-চ-উন এবং ঐতিহাসিক তারানাথ।

খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষে উত্তরভারতে মুসলমান অধিকার প্রতিষ্ঠার সময় থেকে ক্রমে প্রচলিত প্রাচীন চিত্রধারা এবং রাজপুতশৈলীর প্রাথমিক রূপ হিন্দু-বৌদ্ধ-জৈন ধর্মপুস্তক চিত্রায়নের সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে আবদ্ধ হল। সমসাময়িক চিত্রকর্মের দুষ্প্রাপ্যতার জন্য যদিও সঠিক

কিছু বলা সম্ভব নয় তবুও গুজরাটের জৈন ধর্মগ্রন্থে, বাংলার বৌদ্ধ পুঁথিতে এবং নেপালের কিছু ধর্ম পুস্তকের অলঙ্করণ আর দেবদেবীর মূর্তিতে ব্যবহৃত রীতির অনুসরণ করলে ভারতীয় চিত্র পরম্পরার কিছুটা ধারণা করা সম্ভব। হয়ত এই অস্বাভাবিক, সীমাবদ্ধ আড়ষ্টতা থেকে মুক্তি অভিলাষী ভারতীয় চিত্রধারা মার্গশৈলী ছেড়ে লোকশিল্পের মাধ্যমে প্রবাহিত হল। বৌদ্ধ সংস্কৃতির বাহক ভিক্ষু, শ্রমণ মারফৎ জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় শিল্পশৈলী চীন, মধ্য-এশিয়া, ইরান ও পারস্য দেশে প্রসার লাভ করেছিল এবং দ্বাদশ শতকে মুসলমান দিগ্‌বিজয়ীদের সঙ্গে আবার ভারতবর্ষে ফিরে এল সেই ইরান-পারশ্যের সমসাময়িক শিল্পশৈলী। কিন্তু শিল্পশাস্ত্রসম্মত, সুশৃঙ্খল ভারতীয় মার্গচিত্র দাতা থেকে গ্রহীতা হতে নারাজ ছিল তাই সে সময়ের ভারতীয় চিত্রে এইসব বহিরাগত সংস্কৃতির চিহ্ন খুবই ক্ষীণ। শিল্পশাস্ত্রে অজ্ঞ, ফলে বন্ধনহীন সমকালীন লোকশিল্প পারিপার্শ্বিকতাকে স্বীকার করে নিয়ে শুরু করল তার স্থির পদসঞ্চার। ধীরে ধীরে রূপায়িত হল লোকধর্মী রাজপুত চিত্রশৈলী। যার প্রাথমিক নমুনা আজও কিছু দেখা যায় অম্বর, জয়পুর, বিকানীর, যোধপুর, উদয়পুর ইত্যাদি মধ্যযুগীয় প্রাসাদ ভিত্তিচিত্রে। তারপর চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত তুর্কি-আফগান-লোদী ইত্যাদি সুলতানী রাজত্বে ভারতীয় এবং ইসলামী চিত্ররীতির বোঝাপড়া চলতে থাকে। অবস্থার প্রয়োজনে মাঝে মাঝে এরা মিলিত হয়েছে পারস্পরিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে। মোঙ্গোল অভিযানের পথ বেয়ে পঞ্চদশ শতকে মধ্য-এশিয়ায় তৈমুরীবংশের রাজত্বকালীন সমরখন্দ ও হেরাৎ এ পারশ্য শিল্পধারার নব অভ্যুত্থান হল। শিল্প-রসপিপাসু মানুষের কাছে ধর্মের অনুশাসন পরাজিত হল। আবির্ভূত হলেন মহৎশিল্পী বাইজাদ।

কামাল-উদ-দিন বাইজাদ পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি জন্মগ্রহণ

করেছিলেন পারস্যের হেরাৎ নগরে। তাঁর সেখানকার কর্মজীবন সুলতান হোসেন মির্জা এবং তাঁর মন্ত্রী খ্যাতিমান কবি ও চিত্রকর আলী শের নেওয়াইএর পৃষ্ঠপোষকতায় সার্থক হয়ে উঠেছিল। তারপর ১৫১০ খৃঃ তাব্রিজের শাহ ইসমাইল হেরাৎ জয় করেন। তখন থেকে বিজয়ী শাহ ইসমাইলের সঙ্গী হয়ে তাব্রিজে বাসা বাধলেন বাইজাদ। সেখানকার রাজকীয় পুস্তকাগারের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হলেন তিনি এবং পুস্তক চিত্রায়ণের প্রয়োজনে নিজস্ব চিত্রশালাও স্থাপন করলেন সে পুস্তকাগারের সঙ্গে।

রসিক তাব্রিজ শিল্পীকে শিল্পীযোগ্য সম্মানে সম্মানিত করেছিল। সমজদার সুলতান শাহ ইসমাইল যখন ১৫১৪ খৃষ্টাব্দে তুর্কীযুদ্ধে গিয়েছিলেন, তখন তাঁর জীবনের দুই অমূল্যরত্ন লিপিকার শাহ মহম্মদ উন-নিশাপুরী ও চিত্রকর বাইজাদের নিরাপত্তার বিশেষ ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন তিনি। নিভৃত এক পর্বত কন্দরে নির্দিষ্ট হয়েছিল তাঁদের গোপন আবাস। তারপর যুদ্ধবিজেতা শাহ ইসমাইল দেশে ফিরে প্রথমেই সংগ্রহ করেছিলেন এই মনীষীদ্বয়ের কুশল সংবাদ এবং ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়েছিলেন তাঁদের সুষ্ঠ নিরাপত্তা রক্ষার জন্যে।

বাইজাদ ছিলেন পারশ্য-শিল্পপরম্পরার সংস্কারক। তাই পারশ্যে পারশ্য-শিল্পধারার জনকের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে তাঁকে। শ্রেষ্ঠ সংগীতকার সুলভ সুরবিস্তারের মতো সুনিপুণ ছিল বাইজাদের বর্ণব্যবহার। দুঃসাহসী এ শিল্পী বর্ণ-ঝংকারের প্রয়োজনে, বিশেষ করে বস্তু সংস্থাপন দৃঢ় করার জন্যে চিত্রের বিশেষ বিশেষ জায়গায় দরকার মতো নিকষ কালো নিগ্রোমূর্তি স্থাপন করে সক্ষম হয়েছেন অপরূপ বর্ণদ্বন্দ্ব সৃষ্টি করতে। অবয়বের সুষ্ঠ চিত্রায়নে, বাস্তবধর্মী গতিশীলতায় ও ছন্দোবদ্ধ ভঙ্গী রচনায় এবং স্বকীয় পদ্ধতির বস্তু সংস্থাপনে তিনি আজও শিল্পীজগতে অমর হয়ে আছেন।

পারশ্যে বাইজাদ পূর্ববর্তী চিত্রকলার অবসান ঘটে বাইজাদের

উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে এবং বাইজাদ চিত্রশিল্পীর প্রথম পদক্ষেপ শুরু হয় শিল্পী বাইজাদের সার্থক সাধনার মধ্যে।

সেই পরিণত শিল্পধারাকে বহন করে ভারতবর্ষে এলেন মোঘল বাদশাহ বাবর। বাবর নিজে চিত্ররসিক ও বাইজাদভক্ত ছিলেন। তাঁর আত্মজীবনীতে তিনি এই শিল্পী সম্বন্ধে লিখেছেন—'সব শিল্পীর সেরা শিল্পী'। রাজপুত ও পারশ্য চিত্রশৈলীর এ বোঝাপড়া শেষ হল ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে, উদারচেতা মোঘল বাদশাহ আকবরের দরবারে। হিন্দু জ্ঞান, বিদ্যা, সংগীত, চিত্রকলার সঙ্গে মুসলমান সংস্কৃতির সমন্বয় সম্ভব করেছিল সংস্কৃতি-সচেতন আকবরের উদার রাজনৈতিক পন্থা ও গুণীজনের যোগ্য সমাদর। রাজপুত পারশ্য চিত্ররীতির সম্মিলিত রূপ প্রকাশ পেল মোঘল চিত্রশৈলীতে।

আকবরের দরবারে সমান আদরে স্থান পেল পারশ্য ও পারশ্য চিত্রশৈলীতে অনুপ্রাণিত মধ্য-এশিয়ার বিভিন্ন দেশীয় শিল্পীদের সঙ্গে গুণী ভারতীয় শিল্পীরা। একই জায়গায় সমবেত হলেন কালমাক দেশের ফারুক, সেরাজীর আবদ-আল-সামাদ, তাব্রিজের মীর সৈয়দ আলী এবং ভারতীয় মার্গ ও লোকশিল্পী বসবান, দশোবন্ত কেশুদাস প্রভৃতি। এই সব ভারতীয় শিল্পীর চিত্রণ দক্ষতায় আকবর এতই প্রীত হয়েছিলেন যে, বিভিন্ন পারশ্য কবির কাব্যগ্রন্থ চিত্রায়ণ ও রাজকীয় প্রতিকৃতি অঙ্কনে এদের উপরই নির্ভর করতেন তিনি। সার্থক প্রতিকৃতি শিল্পীদের মধ্যে বহু হিন্দু চিত্রকরের নাম দেখতে পাওয়া যায়, বিশেষ করে ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে ভগবতী ও শেষভাগে হুনার যথেষ্ট খ্যাতিমান ছিলেন। ভগবতী যদিও কিছুটা পারশ্য চিত্রধারায় অনুপ্রাণিত, কিন্তু হুনার প্রাচীন ভারতীয় মার্গচিত্র এবং রাজপুত পরম্পরার উত্তরসাধক। এইসব রাজপুত ও মোঘল চিত্রশৈলীর বহু শ্রেষ্ঠ চিত্রকর্মের নায়ক-নায়িকা বাজবাহাদুর ও রূপমতী।

ঊর্ধ্বগামী পথ অতিক্রম করে উপস্থিত হলাম মাণ্ডুর দক্ষিণ প্রান্তস্থ রেওয়াকুণ্ড তীরে। বিগত হিন্দুযুগের স্মৃতিবাহী নামধারক এ কুণ্ডের চার পাড় লাল পাথরে বাঁধান, ঘাটহীন পাথরের দেওয়াল থেকে ধাপে ধাপে একক উপযুক্ত সিঁড়ি চারদিক থেকেই নেমে গেছে নীরব, নিথর, কাল-জল পর্যন্ত। উত্তর-পশ্চিম তীরে রয়েছে জলক্রীড়ান্তে বিলাস অথবা বিশ্রামাগার এবং দক্ষিণ কূলে ফারসি জলোত্তোলন চক্রের ধ্বংসাবশেষ, রাস্তার ওপারে অবস্থিত বাজবাহাদুরপ্রাসাদে জল সরবরাহের জন্য। পথ ঘুরে ফিরে পাহাড় ভেঙে ক্রমেই উপরে উঠেছে, তারই একপাশে ঢালু পাহাড়ের গায় বিস্তীর্ণ মাঠকে সামনে রেখে দাঁড়িয়ে আছে ঐশ্বর্য-অভিশপ্ত এক ভাগ্যহত সংগীতশিল্পীর স্মৃতি-বিজড়িত প্রাসাদ। ছাদের দুই প্রান্তে দুটি সুন্দর হাওয়া ঘর শোভিত মহলের সম্মুখস্থ চল্লিশটি বিশাল রাজকীয় সোপান পেরিয়ে সদর তোরণে প্রবেশ করলাম। দু' পাশে রক্ষীকক্ষ; তাদের মধ্য দিয়ে খিলান শোভিত তোরণ-পথ পেরিয়ে প্রাসাদ প্রাঙ্গণে এলাম, মধ্যস্থলে জলক্রীড়ার চতুষ্কোণ হামাম এবং প্রাঙ্গণসীমার চারিদিক ঘিরে গৃহশ্রেণী। উত্তরের বৃহৎ কক্ষে প্রবেশ করলাম, সামনে তার বৈঠকী বারান্দা, বারান্দার অনেক নীচে মাটি। হয়ত এক সময় এখানে ছিল শ্যামল সুন্দর প্রেমকুঞ্জ যাকে আজকের গভীর বনানী গ্রাস করেছে।

প্রত্যুষের মৃদুমন্দ পবন সুদূর বিস্মৃতি থেকে বহন করে আনছে রূপমতীর স্পর্শ ও ভাগ্যহীন বাজবাহাদুরের প্রেমোজ্জ্বল উপাখ্যান। ১৫৪২ খৃষ্টাব্দে শের শাহ মালব জয় করে প্রতিনিধি রেখে গেলেন সুজা খাঁকে। স্বাধীন সুলতানের সবটুকু সুখ-সুবিধা ভোগ করে সুজা খাঁ গত হলেন ১৫৫৪ খৃষ্টাব্দে। তিন ভায়ের এক ভাই মালিক বায়াজীদ একনিষ্ঠ সংগীত সাধনায় রত ছিলেন এতদিন, পিতার মৃত্যু তাঁকে ঐশ্বর্যে প্রলুব্ধ করল, স্বধর্ম ত্যাগ করে শিল্পী হলেন সুলতান, বায়াজীদ হলেন



কাংড়া চিত্র শৈলী

বাজবাহাদুর ও রূপমতী



(মিশ্র মোঘল ও দক্ষিণী শৈলী ১৭শ খৃঃ অঃ)　　রাগ পঞ্চম

বাজবাহাদুর, ভাই দুটিকে হটিয়ে দিয়ে মাণ্ডুর সুলতানী তক্ত অধিকার করলেন তিনি। তখনও সুরবীণ সাধা হাতে অসি দৃঢ় করায়ত্ত হয়নি, তাই রাজপুতানী রাণী দুর্গাবতীর কাছে যুদ্ধাস্ফালন পরিণত হল চরম বিপর্যয়ে। অবস্থাগতিকে বুঝলেন বেতালা অস্ত্রঝঙ্কার তাঁর পক্ষে অসম্ভব, অতএব সংগীতের চিত্তজয়ী সাধনায় পরাজয়ের গ্লানি মুছে ফেলতে চাইলেন সুলতান। সুরমূর্ছনায় প্লাবিত হল যুগে যুগে রক্তস্নাত মাণ্ডু, পবিত্র হল সিদ্ধ সংগীত-সাধকদের পদধূলিতে। সুরের টানে মাঝে মাঝে সীমা ছেড়ে বেরিয়ে পড়তেন তিনি সীমান্ত সন্ধানে, প্রায়ই দেখা যেত বিন্ধ্যের তলদেশে নিমর উপত্যকার গ্রামে গ্রামে গান গেয়ে ফিরছেন সুরসন্ধানী সুলতান। হয়ত এমনি কোন যাওয়া-আসার পথে প্রথম পরিচয় হয়েছিল তাঁদের, সেদিন বাজবাহাদুরের কণ্ঠে ছিল বসন্তরাগ আর রূপবতী রূপমতী সখিসমভিব্যাহারে এসেছিলেন স্নানে, বসন্ত 'কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল', সুরের ফাঁদে ধরা দিয়ে তাঁর কণ্ঠে জাগল বাহার। ধর্মের বাধা অতিক্রম করে কর্মের এ প্রেম সার্থক হয়ে উঠেছিল তাঁদের জীবনে; মুসলমান বাজবাহাদুরকে ভালবেসে রাজপুতানী রূপমতীকে ধর্মান্তরিতা হতে হয়নি সেদিন, সুরের বাঁধনে বন্দী এ প্রেমিকযুগল ধর্মবিশ্বাসে সম্পূর্ণ স্বাধীন থেকে সৃষ্টি করেছেন তুলনাহীন ইতিহাস।

রেবা তীরের দুর্গাধিপ ঠাকুর থানসিংহ রাঠোর সখীমুখে কন্যা রূপমতীর এ প্রেমকাহিনী শুনে পারিবারিক মর্যাদাহানির আশঙ্কায় শঙ্কিত হলেন। কারণ, সুলতান বাজবাহাদুরকে যুদ্ধে প্রতিরোধ করা তাঁর সাধ্যাতীত। অগত্যা রাজপুতকুলপবিত্রতা রক্ষার শেষ পন্থা, বিষপানে আত্মাহুতি দানের আজ্ঞা দিলেন কন্যাকে। কন্যা-ব্যথা-বিধুরা মাতার শোকাকুল অনুরোধে ঠাকুর তাঁর আজ্ঞা পরদিন প্রভাত পর্যন্ত

স্থগিত রাখতে সম্মত হলেন, তবে নর্মদাদেবীর আশীর্বাদে রূপমতীর সে কালরাত্রি পিতৃগৃহে আর প্রভাত হয়নি। সসৈন্য বাজবাহাদুর সেই রাত্রে হরণ করেছিলেন বীরভোগ্যা রূপবতী রূপমতীকে। তারপর মালবকৌশিক-সুরপুত তাঁদের জীবন মালব তথা সারা মধ্যভারতকে সুর-সুরধনীতে প্লাবিত করেছিল। তৎকালীন মুসলমান ঐতিহাসিক ফেরেস্তাঁ তাঁর রচনায় এর স্বীকৃতি রেখে গেছেন। সংগীত-রস-সমুদ্র-স্নাত বাজবাহাদুর-রূপমতীর ভাগ্যাকাশে ক্রমে নেমে এল ঐশ্বর্যের অভিশাপ। ক্ষণস্থায়ী সুখনিশি অবসানে তাঁরা বুঝলেন তাঁদের অনুসরণ করে চলেছে সিংহাসনের পাপ, তাই সুকুমার সংগীতের কণ্ঠরোধ করে দুর্গ-তোরণে আবার যুদ্ধ-নাকাড়া বেজে উঠেছে। অগত্যা সুরসিদ্ধ হস্ত থেকে বীণা নামিয়ে রেখে, ফেলে দেওয়া জীর্ণ অসি আবার সংগ্রহ করে শেষ রণে যোগ দিতে গেলেন বাজবাহাদুর। আকবর-সেনাপতি আদম খাঁ মালব জয় করলেন সারংগপুর রণক্ষেত্রে (১৫৬১ খৃঃ অঃ) এবং মাণ্ডু দুর্গের তেইশ মাইলব্যাপী পরিধিকে ছ'মাস ধরে অবরোধ করে দুর্গজয় সম্পূর্ণ করলেন (১৫৬৪ খৃঃ অঃ)। স্বামীর পরাজয়ে মুঘল কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্য হিন্দু নারী রূপমতী সতীধর্ম পালন করলেন আত্মাহুতি দিয়ে। মাণ্ডু দুর্গের ইতিহাস ও প্রয়োজন সেদিন থেকে সমাপ্তির পথে পাড়ি দিল।

বারে বারে মোড় ফিরে, চড়াই উৎরাই পাশ কাটিয়ে পাহাড় ভাঙ্গা পথ বেয়ে, উপরে উঠছি আমি। ঘন বনানীর মাঝে মধ্যে হেথায় হোথায় উঁকি দিচ্ছে রূপমতী স্মৃতিসৌধের আকাশ-ছোঁয়া চুড়ো, অশরীরী প্রেমিক যুগলের সুরেলা আকর্ষণে স্থির পদক্ষেপে অতিক্রম করছি ক্লান্তিকর এ পথ, টোড়ী-রাগিণীতে সুরাচ্ছন্ন প্রাণীর মত। সেই

রূপমতী-সান্নিধ্য আমাকে রোমাঞ্চিত করছে। প্রকৃতির ধীর পবনগুঞ্জন কানে আমার ভর্তৃহরির অমরুক গাথা ধ্বনিত করলো :

'ন জানে সম্মুখায়াতে প্রিয়াণি বদতি প্রিয়ে।
সর্বাণ্যঙ্গানি মে যান্তি নেত্রতামুতকর্ণতাম্ ॥'

মধুর কাকলি গুঞ্জরণে প্রিয়া যখন এগিয়ে এলেন, আমি জানি না কেন আমার সকল প্রত্যঙ্গ শুনতে ও দেখতে শুরু করলো। তাজকে সাজিয়েছিলেন ঐশ্বর্য দিয়ে প্রেমিক সম্রাট সাহ্‌জাহান, আর রূপমতী-স্মৃতিসৌধকে সাজিয়েছিলেন প্রকৃতিদেবী তাঁর অন্তরের সুষমায়। প্রাচীন রক্ষী ও পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের শীর্ষদেশের দুই প্রান্তে পদ্মকোরক-সদৃশ দু'টি হাওয়াঘর। মাণ্ডুর দক্ষিণ প্রান্তবর্তী এ হাওয়াঘর থেকে সোজা বারো শ' ফিট নীচে নিমর উপত্যকা পর্যন্ত নেমে গেছে খাড়া পাহাড়। পুণ্যবতী রূপমতীর নিত্যকর্ম ছিল প্রত্যুষে নর্মদা দর্শন ও সঙ্গীত সাধনা, সেইজন্যই তিনি এ প্রাচীন পর্যবেক্ষণ-কেন্দ্রের ভারি স্থাপত্যের উপর নির্মাণ করিয়েছিলেন কুসুম-কোমল হাওয়াঘর যুগল। স্মৃতিসৌধের হাওয়ামহলে একা বসে আছি আমি, সম্মুখে সাজান কাগজ, রঙ, তুলি। পূর্ব-পশ্চিমে মেঘালিঙ্গনমগ্ন বিন্ধ্যাচল, আর নীচে অনেক, অনেক গভীরে নিমর উপত্যকা, সামনে যতিচিহ্নহীন প্রান্তরের আকাশছোঁয়া সীমান্ত। মন আমার মেঘের সঙ্গী হয়ে উড়ে চলেছে দিগদিগন্তের পানে, ললিতের বিষাদমাখা আলাপ ক্ষণে ক্ষণে কানে এসে বাজছে। বিরহ-বেদনা-বিধুর চিত্ত আমার আপ্রাণ চেষ্টায় সংযত করে, চোখের রঙে মনের রঙ মিশিয়ে জন-মন-জয়ী কালোত্তীর্ণ এ প্রেমস্মৃতিসৌধকে চিত্রায়ণে গ্রহণ করবার চেষ্টা করছি। দূরে কুহেলিকা-অবগুণ্ঠন ছিন্ন করা সূর্যকরোজ্জ্বল পুণ্যতোয়া নর্মদা শীর্ণদেহে বিন্ধ্যপদে অভিসারিকা :

'রেবাং দ্রক্ষস্যুপলবিষমে
বিন্ধ্যপাদে বিশীর্ণাম্।'

চিত্র-পঞ্জী



রাজপুত চিত্রশৈলী — গোপন অভিসার



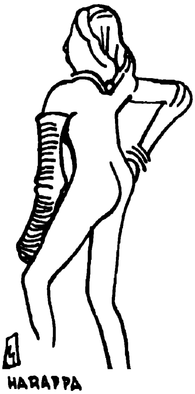


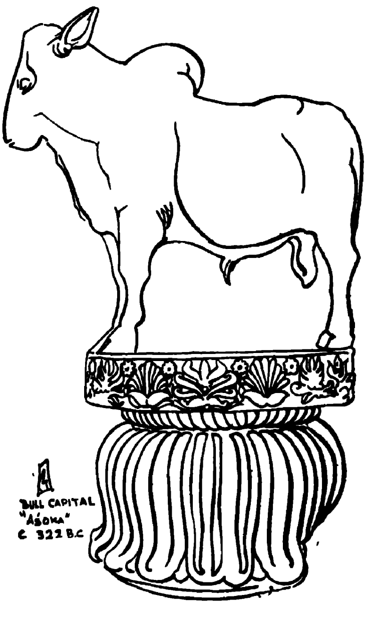
উপরে
মিরাব ও মিম্‌বার
নীচে
সোনগড় দরওয়াজা



রাগ মালব কৌশিক (মিশ্র মোঘল ও দক্ষিণী শৈলী ১৭শ খৃঃঅঃ)







উপরে—নর্তকী ও বৃন্দবাদ্য
ভারহুত (খৃঃ পূঃ ২য় শতক)
ডাইনে—বৃষশীর্ষ অশোকস্তম্ভ
(খৃঃ পূঃ ৩য় শতক)
বামে—নর্তকী
মহেঞ্জদর (খৃঃ পূঃ ৩ হাজার)





উপরে
নৃত্য ও বৃন্দবাদ্য
পাওয়াইয়া (গওয়ালিয়র)
(৪র্থ খৃঃ অঃ)
নীচে
ততবাদক গান্ধার
(১ম খৃঃ অঃ)





উপরে
গজজাতক
অমরাবতী (২য় খৃঃ অঃ)
নীচে
নর্তকী
সিগিরিয়া (৫ম খৃঃ অঃ)





উপরে

নর্তকী ও মঞ্চ

অজন্তা (৪র্থ খৃঃ অঃ)

নীচে

নর্তকী

সিত্তনাবাশিল (৭ম খৃঃ অঃ)



নর্তকী ও বৃন্দবাদ্য (বাঘ ৪র্থ খৃঃ অঃ







উপরে

ততবাদক তুংহুয়ান

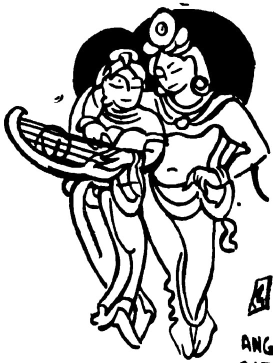
নীচে

বামে—গন্ধর্ব তুংহুয়ান

ডাইনে—ততবাদক তুংহুয়ান

(৪র্থ খৃঃ অঃ)



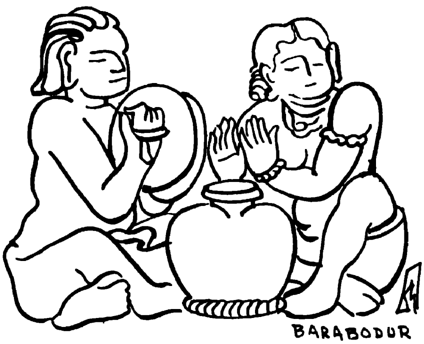






উপরে
বামে—ততবাদক
বাজাক্‌লিক
ডাইনে—ততবাদক
কিজিল
নীচে
ডাইনে—জলকন্যা
দান্দানউইলিক
(৬ষ্ঠ খৃঃ অঃ)
বামে—ততবাদক
অনুরাধাপুরম (২য় খৃঃ অঃ)

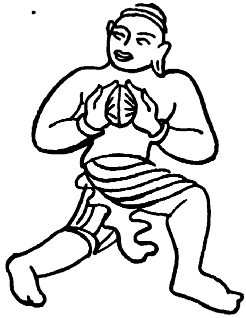




উপরে
তথাগত
বামিয়েন (৬ষ্ঠ খৃঃ অঃ)
নীচে
অবনদ্ধ ও ঘনবাদক
বরবুঁদুর (৮ম খৃঃ অঃ)

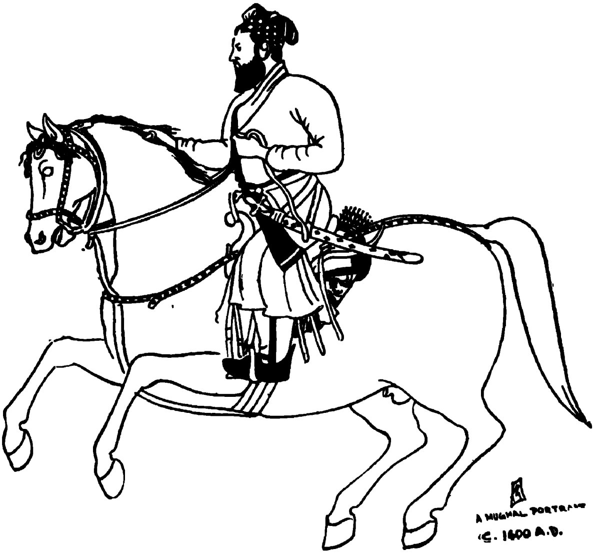








উপরে
বামে—ততবাদক
ডাইনে—অবনদ্ধবাদক
নীচে
বামে—ঘনবাদক
ডাইনে—অবনদ্ধবাদক
পাহাড়পুর (৮ম খৃঃ অঃ)



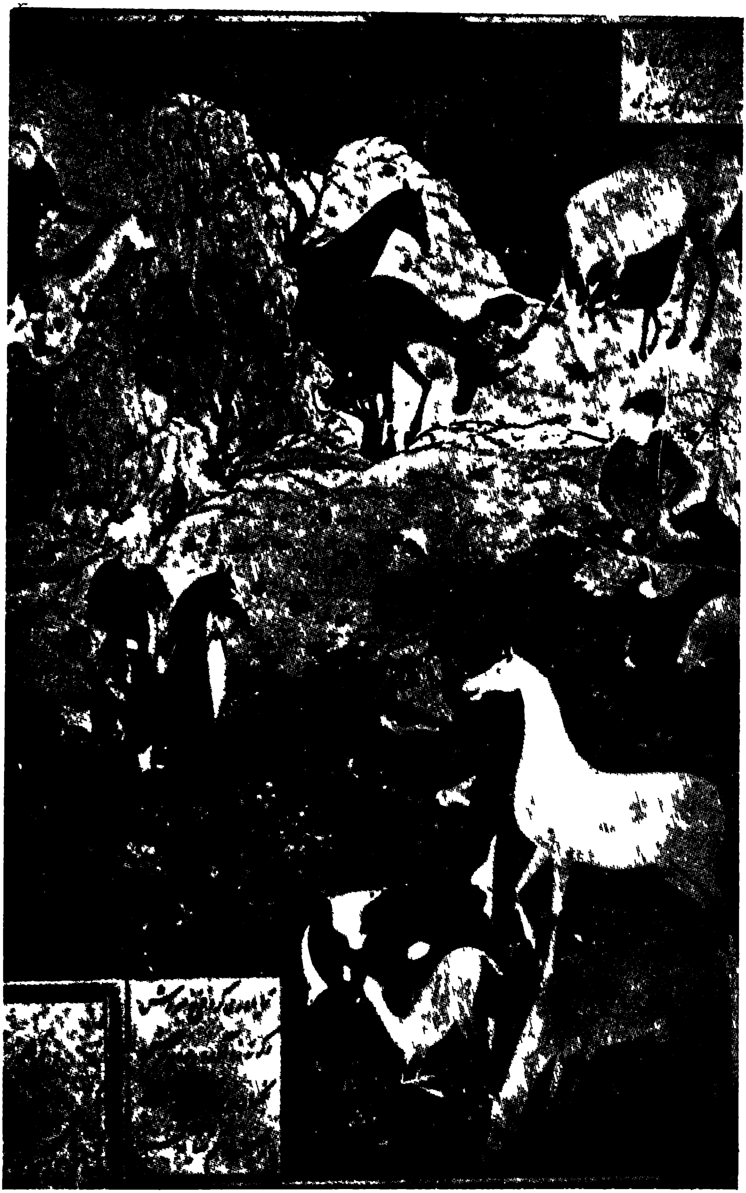


উপরে

বাদসাহের কাবুলস্থ প্রতিনিধি সহীদ খাঁনের প্রতিকৃতি (১৭শ খৃঃ অঃ) মোঘল শৈলী

নীচে

জৈনপুঁথি (১৫শ খৃঃ অঃ)



(পারস্য শৈলী ১৬শ খৃঃ অঃ) বাইজাদ অংকিত চিত্র